

# খাজা গরীবে নেওয়াজ



মুহাম্মদী কুতুবখানা

## প্রকাশনায়

মুহাম্মদ আরিফুর রহমান নিশান  
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কম্পোজ

এনামস্ প্রিন্টার্স এন্ড কম্পিউটার  
৩৯, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট  
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

পুণঃ মুদ্রণ - ২৩ অক্টোবর ০৮ইং

হাদিয়া - ৯০.০০

মুদ্রণে

প্রচ্ছদ : প্যানটোন প্রেস  
মূল বইঃ আনন প্রেস  
নজির আহমদ চৌধুরী রোড  
আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম।

## সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১
প্রাক্তন আজমীর ও বর্তমান আজমীর	৩
খাজা সাহেবের পীর হযরত ওসমান হারুনী (রাঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত	৮
খাজা গরীবে নেওয়াজে বংশ পরিচিতি	১১
খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান আজমীরী (রাঃ) এর জন্ম	১৪
শৈশব কাল	১৫
মারফতের জ্ঞান অন্বেষণে হযরত খাজা (রহঃ)	১৮
পীর ও মুশীদের সেবায় হযরত খাজা (রহঃ)	২১
ওলী আল্লাহগণের দরবারে হযরত খাজা (রহঃ)	২৪
হিন্দুস্থানে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর আগমন	২৯
আজমীর অভিমুখে হযরত খাজা (রহঃ)	৩১
আজমীর অধিপতির কোপানলে হযরত খাজা (রহঃ)	৩৬
পৃথ্বীরাজের নির্ভরশীল স্তম্ভের পতন	৩৭
যোগী অজয় পালের সাহায্য ভিক্ষায় পৃথ্বীরাজ	৩৯
সুলতান শাহাবুদ্দীনের হিন্দুস্থান আক্রমণ	৪৪
ইসলাম প্রচারে হযরত খাজা (রহঃ)	৪৮
ছামা বা কাউয়ালীর অনুরক্ত হযরত খাজা (রহঃ)	৫৪
দলীলুল আরেফীনের সংক্ষিপ্তসার	৫৮
হযরত খাজা (রহঃ) কর্তৃক খাজা বখতিয়ার কাকী (রহঃ) এর নিকট লিখিত কয়েকটি আধ্যাত্মিক চিঠি	৯২
হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজের সংসার জীবন	১১১
খাজা গরীবে নেওয়াজের মাজার	১১৪
মাজার সংলগ্ন উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয় সমূহ	১১৪
গরীবে নেওয়াজের অলৌকিক ঘটনাবলী	১৩২
খাজার তিরোধামের পরবর্তী ফয়জাত	১৩৭
মাজার হতে হস্তক্ষেপ	১৩৯
খাজার দরবারে বিশ্ববরেন্য নেতৃবৃন্দ	১৪০
বার্ষিক ওরস এবং আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি	১৪২
খাজা গরীবে নেওয়াজের আমলিয়াত ও ওজায়েফ	১৪৪
খতমে খাজেগানের নিয়ম	১৫৬

## ভূমিকা

আতায়ে রসুল, কুতুবুল আফতাব, হিন্দাল ওলী, গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশতী (রঃ) এর জীবন চরিত বহুল প্রচারিত, বিভিন্ন ভাষায় তাঁর জীবনালেখ্য বিদ্যমান। কিন্তু সঠিক তথ্যে সমৃদ্ধ জীবনী অতি স্বল্প পরিমাণই পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে উক্ত দুর্বলতাটুকু বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকাবলীতে অতিরিক্ত মাত্রায় দৃষ্টিগোচর হয়।

আমি দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধৈর্যসহকারে অহরহ খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর মাজার জেয়ারতের মাধ্যমে আল্লাহতাআলার উপর দৃঢ় আস্থা সহকারে সূচনা হতে সমাপ্তি পর্যন্ত আজমীর শরীফে অবস্থান করে পুস্তকখানা প্রণয়নের কার্য সমাপ্ত করেছি।

খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশতী (রঃ) হুজুর পাক সরকারে দোজাহান হযরত আহমদ মোজতাবা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কতৃক আশীর্বাদ এবং নির্দেশ লাভ করে আজমীর আগমন করেছিলেন।

স্বল্প পরিসরে তাঁর ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষের জীবন চরিত রচনার দুঃসাহস করা মাত্রাধিক্য। মানবকুল আদিকাল হতে অজানাকে জানার জন্য বিচার বিশ্লেষণে লিপ্ত। সঠিক তথ্যে পুস্তক খানাকে সমৃদ্ধাকারে স্বহৃদয় পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপন করার জন্য ত্রুটিহীনভাবে চেষ্টা করেছি। এর পরও ত্রুটিমুক্ত বলার দুঃসাহস নেই।

রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য বলতে সত্যের প্রকাশ এবং সুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করার প্রয়াস মাত্র। এ পুস্তকে যে সমস্ত কিতাব বা পুস্তকাবলী হতে তথ্য সংগ্রহ করেছি, বিশেষ

করে নয়াদিল্লী হতে প্রকাশিত “ইসলামী ডাইজেস্ট” কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পুস্তকখানা রচনাকালীন সময়ে যে সমস্ত স্বহৃদয় ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। পুস্তকখানা পাঠের পরে যদি কোন মহৎ প্রাণ ব্যক্তির অন্তর আলোড়িত হয়, তবেই মনে করব আমার সার্থকতা।

জীবনী আলোচনার শেষে দলীলুল আরেফীন থেকে খাজা সাহেবের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাষণ ও হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী (রহঃ)কে লিখিত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি উদ্ধৃতি করেছি এবং উপসংহারে খাজা সাহেবের কয়েকটি অব্যর্থ আমল উল্লেখ করেছি, যেন পাঠক মহল উপকৃত হতে পারেন।

প্রণেতা

## ভূমিকা

আতায়ে রসুল, কুতুবুল আফতাব, হিন্দাল ওলী, গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশতী (রঃ) এর জীবন চরিত বহুল প্রচারিত, বিভিন্ন ভাষায় তাঁর জীবনালেখ্য বিদ্যমান। কিন্তু সঠিক তথ্যে সমৃদ্ধ জীবনী অতি স্বল্প পরিমাণই পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে উক্ত দুর্বলতাটুকু বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকাবলীতে অতিরিক্ত মাত্রায় দৃষ্টিগোচর হয়।

আমি দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধৈর্যসহকারে অহরহ খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর মাজার জেয়ারতের মাধ্যমে আল্লাহতাআলার উপর দৃঢ় আস্থা সহকারে সূচনা হতে সমাপ্তি পর্যন্ত আজমীর শরীফে অবস্থান করে পুস্তকখানা প্রণয়নের কার্য সমাপ্ত করেছি।

খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশতী (রঃ) হুজুর পাক সরকারে দোজাহান হযরত আহমদ মোজতাবা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কত্বক আশীর্বাদ এবং নির্দেশ লাভ করে আজমীর আগমন করেছিলেন।

স্বল্প পরিসরে তাঁর ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষের জীবন চরিত রচনার দুঃসাহস করা মাত্রাধিক্য। মানবকুল আদিকাল হতে অজানাকে জানার জন্য বিচার বিশ্লেষণে লিপ্ত। সঠিক তথ্যে পুস্তক খানাকে সমৃদ্ধাকারে স্বহৃদয় পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপন করার জন্য ক্রটিহীনভাবে চেষ্টা করেছি। এর পরও ক্রটিমুক্ত বলার দুঃসাহস নেই।

রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য বলতে সত্যের প্রকাশ এবং সুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করার প্রয়াস মাত্র। এ পুস্তকে যে সমস্ত কিতাব বা পুস্তকাবলী হতে তথ্য সংগ্রহ করেছি, বিশেষ

করে নয়াদিল্লী হতে প্রকাশিত “ইসলামী ডাইজেস্ট” কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পুস্তকখানা রচনাকালীন সময়ে যে সমস্ত স্বহৃদয় ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। পুস্তকখানা পাঠের পরে যদি কোন মহৎ প্রাণ ব্যক্তির অন্তর আলোড়িত হয়, তবেই মনে করব আমার সার্থকতা।

জীবনী আলোচনার শেষে দলীলুল আরেফীন থেকে খাজা সাহেবের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাষণ ও হযরত খাজা বখতিয়ার কাকী (রহঃ)কে লিখিত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি উদ্ধৃতি করেছি এবং উপসংহারে খাজা সাহেবের কয়েকটি অব্যর্থ আমল উল্লেখ করেছি, যেন পাঠক মহল উপকৃত হতে পারেন।

প্রণেতা

## প্রাক্তন আজমীর ও বর্তমান আজমীর

প্রাগ ঐতিহাসিক যুগের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র শহর আজমীরের খ্যাতি রোজ হাশর পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় উজ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। কেননা কালশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, আতায়ে রসুল, খাজায়ে খাজেগান, গরীবে নেওয়াজ, হজরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশ্তী (রঃ) এর মাজার তথায় অবস্থিত।

কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে আজমীরের ঐতিহাসিক গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটতে থাকে কিন্তু খাজা সাহেবের তথায় আগমন এবং অবস্থানের ফলে আজমীরের যেভাবে কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে ও গৌরবের অধিকারিণী হয়েছে তা অবর্ণনীয়।

আজমীর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আরৌলি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র শহর। এর চতুর্পার্শ্বে বহু সংখ্যক উঁচু নীচু পাহাড় বিদ্যমান। এর পূর্ব পার্শ্বে প্রাক্তন রাজধানী কিষাণ গড়, পশ্চিমে সরস্বতী নদী, দক্ষিণে কোগড়া মাটি এবং উত্তরে আরৌলি পাহাড় অবস্থিত।

আখা হতে আজমীরের দূরত্ব ২২৮ মাইল, দিল্লী হতে ২৩৫ মাইল, মুম্বাই হতে ৬৮৭ মাইল এবং লাহোর হতে ৫৭০ মাইল।

আজমীর অতি ক্ষুদ্র শহর কিন্তু মনোরম ও খ্যাতির জন্য এটা পাক ভারত উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ শহর। রাজস্থান মরুভূমিতে অবস্থিত আজমীর বালুকণা, পাথর ও কঙ্করময়। চাষাবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। আজমীর মিউনিসিপালিটি সীমিত পরিমাণ জল সরবরাহ করে থাকে। অবশিষ্ট নিত্য প্রয়োজনীয় পানি জনসাধারণ পাতকুয়া বা বাউড়ী হতে সংগ্রহ করে থাকে। পশু পালন ও কুটির শিল্প জনগণের জীবিকার প্রধান উৎস।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতে রাজা দাসদেব, ভিন্ন মতে ২০০ খৃষ্টাব্দে

রাজা অজয় পাল আজমীর নগরীর গোড়া পত্তন করেন। প্রাক্তন আজমীর শহর আধুনিক আজমীরের উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত।

শাসকগণের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর নামেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যথা- জেদরুক্, জেমীর, আদমীর, জিয়া নগর, জুলুপুর, আজমীর ইত্যাদি। ইতিহাস খ্যাত যোধা রাজা কণিষ্কের পরলোক গমনের পরে ১২০ খৃষ্টাব্দ হতে তার পুত্র হুলিঙ্ক ১৪০ খৃষ্টাব্দ অবধি অত্যন্ত দাপটের সাথে আজমীর শাসন করে। রাজা হুলিঙ্কের পরলোক গমনের পরে রাজা দাসদেব তার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু তার দুর্বল শাসনের কারণে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হতে থাকে। এ সুযোগে নেহালপুর অধিপতি রাজা অজয় পাল রাজধানী গুজরাট হতে আগমন করে বাহুবলে রাজা দাসদেবের সেনা বাহিনীকে পরাস্ত করে রাজপুতনার বিশাল ভূখণ্ড স্বীয় আওতাভুক্ত করে নেয়। আজমীরও উক্ত ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

রাজা অজয় পাল আজমীর অধিকারের পরে তথায় স্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করে একটি পৃথক রাষ্ট্রের সূচনা করেন।

উপরোক্ত বর্ণনামতে রাজা দাসদেব কতৃক আজমীরের গোড়া পত্তন হয়। পরবর্তীকালে রাজা অজয় পাল এর কলেবর বৃদ্ধি করেন মাত্র।

৩৩০ খৃষ্টাব্দ পূর্ব পর্যন্ত আজমীর রাজা অজয় পালের বংশধরগণের শাসনাধীনে ছিল।

অতপর ৩৩০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তবংশের অমিত তেজী রাজা সমুদ্রগুপ্ত রাজপুতনা সমেত সম্পূর্ণ দক্ষিণ ভারত করতলগত করে নেয়।

৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গুপ্তবংশীয় রাজন্যবর্গ আজমীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকে।

কুমার গুপ্তের শাসনামলে ওহুশীগণ হিন্দুস্থান আক্রমণ করে বিস্তার এলাকা দখল করে নেয়।

উক্ত ওহুশী আক্রমণের প্রভাব আজমীরেও অনুভূত হয়। আনুমানিক দেড়শত

বৎসর পরাধীন থাকার পরে পুনরায় আজমীর রাজপুত রাজবংশ চৌহান গোত্রের কবলে আসে। তাদের শাসন কালে আজমীরের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়।

১০০০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে গজনী রাজ্যের শাসক আমীর নাসীরুদ্দিন সবুজগীন হিন্দুস্থান আক্রমণ করে কাবুল এবং পাঞ্জাবের রাজা অজয় পালের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। উক্ত যুদ্ধে রাজা অজয় পাল পরাজিত হয়ে সন্ধির মাধ্যমে কর দানে স্বীকৃত হয়।

রাজা অজয় পাল লাহোর প্রত্যাবর্তনের পর সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করে ধর্ম ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার আবেদন জানিয়ে আজমীর, কলঞ্জর, দিল্লী, কনৌজ প্রভৃতির প্রতাপশালী রাজ্য বর্গের সহায়তায় একটি শক্তিশালী সম্মিলিত বাহিনী গঠন করে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করে। আমীর সবুজগীন সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করে কাবুল ও পেশোয়ারের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড অধিকার করে নেন।

পরাজয়ের গ্লানিতে রাজা অজয় পাল আত্মহত্যা করার পরে তার পুত্র আনন্দ পাল স্থলাভিষিক্ত হয়। আমীর সবুজগীনের পরলোক গমনের পরে তাঁর সুযোগ্য সন্তান মাহমুদ গজনবী শাসনভার গ্রহণ করেন। অপর দিকে আনন্দ পাল পিতৃ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে পূর্বোক্ত সন্ধি লঙ্ঘন করে নানা রূপ টাল বাহানা করে পুনর্বীর যুদ্ধের সূত্রপাত করে।

যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে আনন্দ পাল কাশ্মীরে পলায়ন করে। পরের বছর পুনরায় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে গোয়ালিয়র, আজৌন, আজমীর, দিল্লী, কনৌজ প্রভৃতির রাজ্য বর্গের সহযোগিতায় এক বিরাট সমন্বিত বাহিনী গঠন করে পেশোয়ারের নিকট সুলতানী বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সুলতানী বাহিনী সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করে কানগড় অবধি অগ্রসর হয়।

১০২৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ গজনবী আজমীর আক্রমণ করে আজমীরের রাজা বিশাল দেবকে পরাস্ত করে, পরে বিশালদেব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে সুলতান রাজ্যটি প্রত্যর্পণ করেন। আজমীরে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করে তিনি স্থায়ী রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১০৩০

খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

১০৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজপুতগণের ভাগ্যাকাশ পুনরায় উজ্বল হয়ে উঠে। তারা সুলতান মাহমুদ গাজনবীর প্রতিনিধিকে হত্যা করে পুনর্বীর আজমীরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। রাজপুতগণ সর্বসম্মতভাবে সারঙ্গদেবকে আজমীরের অধিপতি মনোনীত করে। কিছুদিন পরে সারঙ্গদেবের মৃত্যু হলে রাজা আনাদেব ক্ষমতা লাভ করে।

আনাদেব আজমীরে একটি প্রকাণ্ড দিঘি খনন করায়। বর্তমানে সেটি আনা সাগর নামে পরিচিত। আনাদেবের মৃত্যুর পরে পৃথ্বীরাজ বা পৃথ্বীরায় আজমীরের সিংহাসনে আরোহণ করে। তার রাজত্বকালে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) আজমীরে পদার্পণ করে ইসলাম ধর্মের বীজ বপন করেন, তা পাক ভারত উপমহাদেশে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে মহীপালরূপে অদ্যাবধি ছায়া প্রদান করছে এবং কাল কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

তারাগড় পাহাড়ের উপর নির্মিত দুর্গ রাজা পৃথ্বীরাজের একটি স্মরণীয় স্থাপত্য। উহা লাল পাথর দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল।

উক্ত দুর্গের রক্ষণশীল ব্যবস্থা এবং নয়নাভিরাম স্থাপত্যের কারণে রাজপুতগণ রাজা পৃথ্বীরাজের প্রতি ঈর্ষার ভাব পোষণ করতো।

১১৯১ খৃষ্টাব্দে সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘোরীর সাথে তারৌড়ী নামক স্থানে পৃথ্বীরাজের একটি ভীষণ যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে শাহাবুদ্দীন ঘোরী মারাত্মক ভাবে আহত হলে অজ্ঞান অবস্থায় তাকে একজন খিল্জী ক্রীতদাস অশ্বপৃষ্ঠে করে লাহোর নিয়ে যায়। সুলতানী বাহিনী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাজধানী গজনী প্রত্যাবর্তন করে।

উক্ত পরাজয়ে সুলতান মানসিকভাবে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন। এক প্রকার, আহার নিদ্রা পরিহার করে পুনরায় তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। ইত্যবসরে তিনি খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) এর অলৌকিক আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে পুনরায় হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন। পৃথ্বীরাজকে সমর্থন

দানকারী প্রায় শতাধিক রাজন্যবর্গের এক দুর্জয় সমন্বিত বাহিনীর সাথে পূর্বোক্ত তারৌড়ী যুদ্ধ ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মাধ্যমে পৃথ্বীরাজ সমেত অন্যান্য ২০ জন রাজাকে বন্দী কিংবা হত্যা করে হিন্দুস্থানে ইসলামের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেন। উক্ত যুদ্ধের ফলে দিল্লী এবং আজমীর সুলতানের করতলগত হয়।

পাক ভারত উপমহাদেশে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরে অন্ততঃ পক্ষে উহা ২৫০ বছরাবধি অটুট ছিল।

১৩৮০ খৃষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলক পরলোক গমন করায় দিল্লীর কেন্দ্রীয় প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই লগ্নে সিংহাসনের দাবীদারগণ আত্ম কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। রাজপুত রাজন্যবর্গ উক্ত সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কাল বিলম্ব না করে ১৪০০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আজমীর অধিকার করে নেয়।

রাজন্যবর্গ ৫৪ বছরাবধি আজমীর শাসন করে। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে একটি ভয়াবহ যুদ্ধের মাধ্যমে গুজরাটের বাদশাহ মেওয়াটের রাজাদের নিকট হতে আজমীরের আধিপত্য লাভ করেন। কিন্তু পরের বৎসর মেরওয়াটের রাঠুর গোত্র গুজরাটের সুলতানী বাহিনীকে আজমীর হতে বিতাড়িত করে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আজমীর শাসন করে।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস খ্যাত মোগল বাদশাহ শাহ জালানুদ্দীন আকবর আজমীর অধিকার করে নেন। মোগল বাদশাহগণ ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অত্যন্ত দাপটের সাথে আজমীর শাসন করেন। তাঁদের আমলে আজমীরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

মোগল বাদশাহগণ আতায়ে রসূল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর মাজার শরীফে বহু সুরম্য অট্টালিকাদি নির্মাণ করে খাজা সাহেবের প্রতি ভক্তির চরম নিদর্শন স্থাপন করে যান।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হতে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আজমীর প্রবল পরাক্রান্ত মোগল বাদশাহগণের করতলগত ছিল।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর পরলোকগমন করার পরে মোগল সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। সিংহাসনের দাবীদারগণ আত্ম কলহে

লিপ্ত হয়ে একে বেশ অগ্রগামী করে তোলে।

নাদীর শাহ ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করার ফলে তা তীব্র আকার ধারণ করে।

আনুমানিক ২০ জন করদ রাজা এবং নবাবগণ স্বঘোষিত রাজা বাদশাহ উপাধি ধারণ করে বিশাল মোঘল সাম্রাজ্যকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলে।

উপরোক্ত সুযোগে রাঠুর রাজবংশ পুনরায় আজমীর দখল করে নেয়। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়রের রাজা সন্ধ্যা রায় রাঠুর রাজবংশকে পরাস্ত করে আমীর শাসন করার ক্ষমতা লাভ করে। আজমীর ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মারাঠাগণের অধীনে থাকে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সন্ধা রায়ের সাথে সন্ধি স্থাপন করে আজমীরের শাসনভার হস্তগত করে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতালগ্নে আজমীর ভারত সরকারের অন্তর্ভুক্ত হয়। অদ্যাবধি আজমীর ভারত সরকারের অঙ্গরাজ্য রাজস্থান এর আওতাধীন একটি জেলা।

## খাজা গরীবে নেওয়াজের পীর-মুর্শিদ হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রাঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

তৎকালীন সময়ের সুপ্রসিদ্ধ ওলী ও কামেল দরবেশগণের মধ্যে খাজা ওসমান হারুনী ছিলেন অন্যতম। তাঁর প্রকৃত নাম ওসমান। বংশগতভাবে তিনি আবু নূর হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। তাঁর বংশধরগণ শেরে খোদা হজরত আলী (কঃ) এর সাথে সম্পৃক্ত। কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা মতে তিনি ৫২৬ হিজরী সালে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু বহু সংখ্যক লেখকের মতে তাঁর সঠিক জন্মতারিখ অজ্ঞাত।

পিতা মাতার তত্ত্বাবধানে তিনি প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত করেন। অতি অল্প বয়সে তিনি কোরআনে হাফেজ হন। প্রবাদ আছে যে, শৈশবকালেই তিনি প্রত্যহ একবার করে কোরআন শরীফ খতম করতেন। বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করার পরে সেই যুগের প্রখ্যাত ওলেমায়ে কেরামগণের নিকট হতে জাহেরী

জ্ঞান অর্জনে আত্ম নিয়োগ করেন। জাহেরী জ্ঞান অর্জনের পরে তৎসময়ের বিখ্যাত দরবেশ হাজী শেখ শরীফ জিন্দানী (রাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট মুরীদ হন। কেবল মাত্র তিন বৎসরকাল সময়ের মধ্যে মারেফত বা বাতেনী স্তর সমূহ অতিক্রম করে ৪ তরিকার খেলাফত প্রাপ্ত হন। খেলাফত প্রদান কালীন চারি তরিকার মাহত্ব্য বর্ণনা করে তদীয় মুর্শীদ বলেন, ৪ তরিকার ভাবার্থ হল যে, ১ম, পার্থিব জগৎ হতে মোহমুক্ত থাকা, ২য়, রিপূর বশীভূত না হওয়া, ৩য়, জীবন রক্ষার্থে স্বল্পহার করা, ৪র্থ, অপরের হক ধ্বংস হতে বিরত থাকা। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, উপরোক্ত বস্তু সমূহ যথাযথভাবে পালনকারী ব্যক্তি পীর হিসেবে সমাদৃত হতে পারে।

## হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রাঃ) এর শজরায়ে তরিকত নিম্নরূপ\*

- ১। হযরত আলী (কঃ)।
- ২। হযরত খাজা হাসান বসরী (রাঃ)।
- ৩। হযরত শেখ আবুল ফজল আবদুল ওয়াহেদ বিন সায়েদ (রাঃ)।
- ৪। হযরত খাজা ফজীল বিন্ আয়্যাজ (রাঃ)।
- ৫। হযরত ইব্রাহীম আদহাম বলখী (রাঃ)।
- ৬। হযরত খাজা সরিদুদ্দীন হুজাইফা আলমরউশী (রাঃ)।
- ৭। হযরত আইনুদ্দীন আবী হবীরাতুল বসরী (রাঃ)।
- ৮। হযরত খাজা মমশাদউল বিনূরী (রাঃ)।
- ৯। হযরত খাজা আবুল ইসহাক শামী হাস্নি (রাঃ)  
(চিশতীয়া ছিলছিলার প্রবর্তক)।
- ১০। হযরত খাজা আবু আহমদ চিশতী (রাঃ)।
- ১১। হযরত খাজা মোহাম্মদ চিশতী (রাঃ)।
- ১২। হযরত খাজা আবু ইউসুফ নাসিরউদ্দীন চিশতী (রাঃ)।
- ১৩। হযরত খাজা মোহাম্মদ মাওদুদ চিশতী (রাঃ)।
- ১৪। হযরত খাজা হাজী শেখ শরীফ জিন্দানী (রাঃ)।
- ১৫। হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রাঃ)।

## খাজা ওসমান হারুনী (রাঃ) এর

### আধ্যাত্মিক জীবন

প্রবাদ আছে যে, খাজা ওসমান হারুনী (রাঃ) জীবনের ৭০ বছর কাল অবধি মারেফতের সুধা পানে রত ছিলেন। উক্ত সময়ে কষ্টকালেও তিনি উদর পূর্ণ করে আহাৰ করেননি বরং বিনিদ্র রজনীতে আল্লাহতাআলার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি প্রায়শঃ দৈনিক এক অথবা দুই বার কোরআন খতম করতেন। তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত আলেম ও কামেল দরবেশগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন।

## ওসমান হারুনী (রাঃ) এর অলৌকিক ঘটনাবলী

হযরত ওসমান হারুনী (রাঃ) এর অলৌকিক ঘটনাবলী সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ পাবার পরে একদা ৭০ জন লোক সমবেত ভাবে ওসমান হারুনী (রাঃ)কে পরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ করে তাঁর খানকায় উপস্থিত হল।

উক্ত ব্যক্তিগণ স্থির করেছিল যে, ওসমান হারুনী (রাঃ) যদি প্রকৃত কামেল দরবেশ হয়ে থাকেন, তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্ব স্ব পছন্দসই সুস্বাদু খাদ্য দ্বারা আপ্যায়ন করাবেন।

হযরত ওসমান হারুনী (রাঃ) এর দরবারে সবাই এক সাথে উপস্থিত হলে, হারুনী (রাঃ) তাদের আসনের ব্যবস্থা করে নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ পাঠ করলেন।

وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ الْمُسْتَقِيْمِ .

“ওগো হুয়াহুদি মাইয়াশাউ ইলা সেরাতিম মুসতাক্বিম” এবং খোদার দরবারে প্রার্থনা করতে লাগলেন। ইত্যবসরে আগন্তুক ৭০ জন লোকের

সম্মুখে গায়েব হতে পৃথক পৃথক ভাবে সুস্বাধু খালা পূর্ণ খাবার এসে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। অনুরূপ ঘটনার জন্য তারা মানসিক ভাবে মোটেই প্রস্তুত ছিলনা। অতঃপর অত্যন্ত মিনতি সহকারে ক্ষমা শিক্ষা করে তারা হযরত ওসমান হারুনীর নিকট মুরীদ হয়ে গেলেন।

খাজা সাহেব স্বীয় পীরের কেলামত বর্ণনা করে বলেন যে, একবার কোন এক জায়গায় যাত্রাকালে হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) এর সঙ্গে আমিও ছিলাম। যাত্রাপথে একটি নদীর ধারে উপস্থিত হবার পরে আমি নিকটে কোন প্রকার নদী পারাপার না দেখায় হতাশ হয়ে নিখর অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি আমার মনোভাব বুঝতে পেয়ে বললেন, “চক্ষু বন্ধ কর”। কিছুক্ষণ পরে বললেন, “চক্ষু খোল”। আমি চক্ষু খুলে হতবাক ছিলাম যে, আমরা উভয়ে নদীর অপর পারে অবস্থান করছি।

ওসমান হারুনী (রঃ) এর অসংখ্য কেলামত আছে। পাঠক মহোদয়গণের সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে খোদা চাইলে আগামী সংস্করণে আরও কিছু কেলামত পেশ করব।

### আতায়ের রসূল গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশ্তী (রঃ) এর বংশ পরিচিতিঃ

- আমীরুল মোমেনিন সৈয়্যদেনা হযরত আলী (কঃ)
- সৈয়্যাদুশ শোহাদা সৈয়্যদেনা ইমাম হোসাইন (রঃ)
- ইমামুল মুত্তাকীন সৈয়্যদেনা হযরত জয়নুল আবেদীন (রঃ)
- ইমামুস্ সাদেকীন সৈয়্যদেনা ইমাম জাফর সাদেক (রঃ)
- ইমামুল মুসলেমীন সৈয়্যদেনা হযরত মুসা কাজেম (রঃ)
- ইমামুল আরেফীন সৈয়্যদেনা হযরত ইমাম মুসা রেজা (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত ইব্রাহীম (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত খাজা আবদুল আজীজ (রঃ)

- সৈয়্যদেনা হযরত নজমুদ্দীন কাহের (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত আহম্মদ হোসাইন (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত কামাল উদ্দিন (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত গিয়াস উদ্দিন হাসান (রঃ)
- আতায়ের রসূল গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশ্তী (রঃ)।

### আতায়ের রসূল গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশ্তী (রঃ) এর মাতৃ বংশ পরিচিতি

- আমীরুল মোমেনীন হযরত সৈয়্যদেনা আলী (কঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত ইমাম হাসান (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত মোসান্না (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত আবদুল্লাহ মহুয (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত মুসা সোন্ (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত আবদুল্লাহ সানী (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত মুসা সানী (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত দাউদ (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত খাজা মোহাম্মদ রুহী (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত এয়াহীয়া জাহেদ (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত খাজা আবদুল্লাহ জম্বলী (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত খাজা দাউদ সানী (রঃ)
- সৈয়্যদেনা হযরত বিবি মাহনূর উনুল ওয়ারা (রঃ)
- আতায়ের রসূল গরীবে নেওয়াজ হযরত সৈয়্যদ খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশ্তী (রঃ আঃ)

## আতায়ে রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর উপাধি সমূহের বিশ্লেষণ

আতায়ে রসুল গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশ্‌তী (রঃ) এর আদি নাম “মঈনুদ্দীন হাসান”

কিন্তু বিভিন্ন জীবনী লেখকগণ তাঁকে বিভিন্ন ধরনের উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। যেমন- মঈনুল হক, মাহবুবে খোদা, হুজাতুল আওলীয়া, কুতুবুল আকতাব, তাজুল আউলীয়া, খাজায়ে খাজেগান, হাজীউল হেরমাঈন, আতায়ে রসুল ইত্যাদি।

সঞ্জর গ্রামে তাঁর পয়দায়েশ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। বহু লেখকবৃন্দের মতানুযায়ী তিনি “সখবস্থানে” জন্ম গ্রহণ করেন। ভিন্ন মতে দ্বার সান্‌জান ইস্পাহান্‌ সঞ্জর কিংবা সীস্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন।

তদ্বিষয়ে যাতে বিতর্কের উৎপত্তি না হয়, উপরন্তু বহুকালাবধি পাক-ভারত উপমহাদেশে তিনি সঞ্জরী হিসেবে সর্বজন বিদিত বিধায় আমিও তাকে সঞ্জরী নামে অভিহিত করেছি। তাঁর বহুসংখ্যক ভক্তকুল খাজা সাহেবকে চিশ্‌তী আজমীরী নামে ভূষিত করে থাকেন। তিনি আজমীরী হিসেবে খ্যাত হবার যুক্তিযুক্ত কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, জীবনের অতীব মূল্যবান ৪০টি বছর চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পাহাড় বেষ্টিত আজমীরের রক্ষ মরু প্রান্তরে কালাতিপাত করেন। তাঁর চিশ্‌তী নামের পশ্চাতেও বিভিন্ন হেতু পরিলক্ষিত হয়।

তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত খাজা ওসমান হারুনী চিশ্‌তী (রঃ) চিশ্‌তীয়া তরিকতের ওলীয়ে কামেল ছিলেন।

চিশ্‌ত হেরাতের অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম। বর্তমানে উহা “সাকলান” নামে পরিচিত।

অন্য তথ্যে জানা যায় যে, দিকে দিকে যখন ইসলাম ধর্মের বিস্তার হচ্ছিল, সেই সময়ে ইরান ও আফগানিস্থানে ব্যাপক হারে অগ্নি উপাসনা

প্রচলিত ছিল। উক্ত অগ্নি উপাসকগণের প্রধান পূজ্যকে তারা চিশ্‌তী নামে সম্বোধন করত। তাদের ধারণা মতে চিশ্‌তী এর প্রকৃত অর্থ এরফানে এলাহী।

তৎসময়ে সুধীবৃন্দ এবং ওলী আল্লাহগণ হক এবং বাতেল সম্বন্ধীয় জ্ঞান গর্ভ উপদেশ দিয়ে বহু সংখ্যক অগ্নি উপাসকগণকে সাম্যের স্নিগ্ধ ছায়া তলে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

উক্ত নও মুসলমানগণ তাদের সত্য রাস্তা প্রদর্শনকারী মহাত্মাগণকে ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে চেয়ে তাদের চিশ্‌তী নামে সম্বোধন করত। কালক্রমে উক্ত মহাত্মাগণের আধ্যাত্মিক প্রতিনিধিগণও চিশ্‌তী লকবে সমাদৃত হতে থাকেন।

## খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী (রঃ) এর জন্ম

আতায়ে রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর জন্ম তারিখের ব্যাপারে দুইটি বক্তব্য পাওয়া যায়। কোন কোন লেখক ৫৩০ হিজরী সনে, আবার কেউ কেউ ৫৩৭ হিজরী সনে তিনি ভূমিষ্ঠ হন বলে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু ৫৩৭ হিজরী সনে জন্মের স্বপক্ষে বেশী সংখ্যক লেখক একমত। অতএব, ৫৩৭ হিজরী সনের রজব মাসের ১৪ তারিখ সোমবার প্রত্যুষে মাতৃক্রোড় অলঙ্কৃত করে মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী (রঃ) ধরাতে শুভাগমন করেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক এবং সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর মাতার নাম বিবি মাহনূর (রঃ)। তিনি অত্যন্ত ধর্ম ভীরু এবং পরহিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁর দ্বার হতে কোন অভাবগ্‌স্ত ব্যক্তি রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্তন করতে পারত না। রত্নগর্ভা জননী “বিবি মাহনূর” বিদূষি এবং অত্যন্ত খোদাভক্ত পরহেজগার মহিয়সী রমণী ছিলেন।

তাঁর মাতা ইস্পাহানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী (রঃ) ব্যতিত আরও দুই জন সন্তান তাঁর কোলে আগমণ

করেছিলেন কিন্তু ঐতিহাসিকগণ উক্ত সন্তানদ্বয়ের জীবনী আলোচনা হতে এক প্রকার নীরব ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। খাজা সাহেবের গর্ভস্থিত অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর জননী স্বীয় জবানীতে যা প্রকাশ করেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

“আমার খোকামনির পয়দায়েশের সূচনা হতে সর্বাবস্থায় পুলকিত থাকতাম। দৈনন্দিন অবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল। স্বচ্ছলতা যেন আমার দ্বারে করাঘাত করতে লাগল। যেদিন থেকে তাঁর দেহে প্রাণের সঞ্চার হল, সেদিন হতে জঠরাভ্যন্তরে “কলেমা তৈয়বার” ধ্বনি শ্রবণ করতে লাগলাম। আমার মঈনুদ্দীন ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাব্য দিবসের প্রত্যয়ে বাসগৃহে অলৌকিক রশ্মি বিকিরণ হতে থাকে। আমার চতুর্পার্শ্বে স্বর্গীয় আলোকজ্জ্বল বিশিষ্ট চেহারা দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ি। সপ্নক্ষণের জন্য সমুদয় বিস্ময় আমার দৃষ্টি শক্তির আওতা হতে সরে গেল। পরে যখন খোকন সোনার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করি যে, সে যেন সেজদারত অবস্থায়। তা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। মাতৃত্বের আতিশয্যে স্বীয় ক্রোড়ে উঠিয়ে নেয়ার পর লক্ষ্য করলাম তাঁর দৃষ্টি উপরে দিকে নিবদ্ধ। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ পূর্বক উর্ধ্বে লক্ষ্য করে দেখি যে, বহু সংখ্যক নূরানী অবয়ব আলোকজ্জ্বল পাগড়ী মাথায়, সৌম্যকান্তি দরবেশ ধরণের ব্যক্তিবর্গ বিদ্যমান। তাঁদের নিকট হতে উৎকৃষ্ট ধরণের সুঘ্রান প্রবাহিত হতেছিল। উপরোক্ত দৃশ্যাবলী দর্শনে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ায়, একজন দরবেশ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমরা বর্তমান যুগের আবদাল এবং ওলীয়ে কামেল ব্যক্তিবর্গ। অতএব তুমি সন্ত্রস্ত হয়োনা। অদ্য তোমার বাসগৃহে মঈনুদ্দীন ভূমিষ্ঠ হবার কারণে, তাঁকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করতে আমরা সমবেত হয়েছি। উপরোক্ত বাক্যসমূহ বলার পরে তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন”।

## শৈশব কাল

খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী (রঃ) এর শৈশবকালীন বিদ্যা অর্জনের

ব্যাপারে তাঁর জীবনী লেখকগণ উল্লেখযোগ্য কিছুই লিপিবদ্ধ করে যান নি।

কিছু সংখ্যক লেখকের বিবরণীতে জানা যায় যে, সল্প বয়সে অর্থাৎ ৬/৭ বৎসর বয়সকালে কোরআনে হাফেজ হবার পর মাতা পিতার তত্ত্বাবধানে উচ্চতর বিদ্যা অর্জন করেন। এলমে জাহেরীতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে, স্থানীয় মাদ্রাসা হতে আরবী ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করে ছিলেন।

যা হোক, যেহেতু তাঁর জন্ম স্বচ্ছল, ধর্মভীরু এবং খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবারে, সেহেতু তাঁর বাল্যশিক্ষা সুচারু রূপে পরিচালিত হবার ব্যাপারে কোন মতদ্বৈধতা নেই।

তাঁর স্বর্গীয় পিতা সৈয়দ খাজা গিয়াসউদ্দীন (রঃ) স্বীয় আবাস ভূমি হতে হিজরত করে অনিবার্য কারণে স্বপরিবারে ইরাক চলে যান। তিনি ইরাক ভূখণ্ডেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর পিতৃ বিয়োগের ব্যাপারেও ভিন্ন ভিন্ন মতের অবতারণা দেখা যায়। তাঁর ১১/১২ কিংবা ১৫ বৎসর বয়সকালে পিতৃ বিয়োগ ঘটে বলে ভিন্ন ভিন্ন লেখকগণের লেখা হতে জানা যায়।

অপর দিকে তাঁর পিতার তিরোধান স্বনিবাস সঞ্জর গ্রামে হয় বলেও বহু লেখক দাবী করেন।

যা হোক, পিতার অভাবনীয় তিরোধানের কারণে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর মাতা সন্তান দুয়কে সাথে করে সঞ্জর গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন।

পৈত্রিক সূত্রে তিনি একটি পান চাক্কি (বা গম পিষার যাতা) এবং একখানা ফলের বাগান লাভ করেছিলেন।

তিনি স্বয়ং উক্ত বাগানের পরিচর্যা করতেন। বাগানের এবং আটা চাক্কির লব্ধ আয় হতে দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করতেন।

একদা বাগানের পরিচর্যারত অবস্থায় একজন কামেল আত্মভোলা

দরবেশকে দর্শনের অব্যবহিতপরে অত্যন্ত সম্মানের সাথে একটি ছায়াদার বৃক্ষের শীতল ছায়াতলে দরবেশ মহোদয়ের জন্য আসন পতে দিলেন। অতঃপর কিছু ফল এনে তাঁকে নজরানা দিলেন।

বালক মঈনুদ্দীনের উক্ত আচরণে, দরবেশ সাহেব অত্যন্ত প্রীত হয়ে স্বীয় জম্বুল বা থলে হতে সামান্য পদার্থ বা বস্তু (খড়িমাটি বা শুকনা ফল) স্বীয় মুখে চর্বন করে বালক মঈনুদ্দীন (রঃ)-কে প্রদান করলেন।

খাজা সাহেব উক্ত তবরুক সরল মনে গলধঃকরণ করার অব্যবহিত পরে বালক হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ঝড়ের পূর্বাভাস শুরু হয়ে গেল। তাঁর হৃদয় অজানাকে জানার জন্য পুলকিত হতে লাগল। যেন অনেক দূর-দূরান্ত হতে প্রেমিক ইঙ্গিতে বলছে তোমাকেতো পার্থিব জগতের মোহাধিত করে সৃষ্টি করা হয়নি। কাল বিলম্ব না করে আমার পানে অগ্রসর হও।

উক্ত দরবেশের পরিচিতির ব্যাপারে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই লেখকগণ লিপিবদ্ধ করে যান নি। কেবল মাত্র তাঁর নাম ইব্রাহিম কান্দুজী বা ইব্রাহিম কলন্দর বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

দরবেশ সাহেবের সাথে সাক্ষাতের পর খাজা সাহেবের মনে ভাবান্তর হলো, মাতার অনুমতি সাপেক্ষে তাঁর সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় লব্ধ অর্থ হতে জননীকে সামান্য এবং নিজের জন্য সামান্য অর্থ রেখে অবশিষ্ট অর্থ অভাবগ্রস্তগণকে দান করে সত্যের সন্ধানে নব যৌবনের সমস্ত ভোগ লালসাকে পশ্চাতে রেখে সমরখন্দ এবং বোখারার রাস্তা ধরে অগ্রসর হতে লাগলেন।

মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে ৫৫২ হিজরী সনে তিনি জ্ঞান অন্বেষণে স্বগৃহ ত্যাগ করেন।

উক্ত কচি বয়সে পথ চলার কষ্ট, ক্ষুধা-পিপাসার কাতরতা, দস্যু ভয়, যান-বাহনহীন রুম্ম পরিবেশকে উপেক্ষা করে, শিক্ষা সফর করতে

সক্ষম হয়েছিল কেবলমাত্র পরম করুণাময়ের উপর ভরসা এবং তাওয়াক্কুলের দৃঢ়তার কারণে।

তৎকালীন সময়ে সমরখন্দ ও বোখরা ছিল প্রখ্যাত ওলেমায়ে কেরাম ও সূফীয়ানে কামেলের প্রাণকেন্দ্র।

খাজা সাহেব সমরখন্দ উপস্থিত হয়ে প্রখ্যাত আলেম মৌলানা শরফুদ্দীন (রঃ) এর খানকায় উপস্থিত হন। মৌলানার সু-দৃষ্টির ফলে এবং বিশেষ তত্ত্বাবধানে থেকে অতি স্বল্প সময়ে “জাহেরী” বিদ্যায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর বোখারার বিখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা হেসামুদ্দীন (রঃ) এর নিকট হতে ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভ করেন। তিনি সমরখন্দ এবং বোখারায় সর্বমোট ৫ বৎসর কাল অবস্থান করেন। কিন্তু আল্লাহতায়াল্লা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন বিশেষ উদ্দেশ্যে। কাজেই এলমে জাহেরীতে বুৎপত্তি লাভ করার পরে তাঁর হৃদয়ে “বাতেনী” জ্ঞান অর্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হতে লাগল।

### মারেফতের জ্ঞান অন্বেষণে হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী (রঃ)

খাজা সাহেবের “এলমে বাতেনী” জগতে প্রবেশের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। কারো কারো মতে তিনি হারুন নগরে হযরত খাজা ওসমান হারুনীর হস্তে মুরীদ হন।

ভিন্ন মতে দেখা যায় যে, তিনি বাগদাদে অবস্থিত হযরত জে নাইদ বোগদাদী (রাঃ) এর মসজিদে হজরত ওসমান হারুনী (রঃ) এর হস্তে মুরীদ হন। কিন্তু খাজা সাহেব “আনীসুল আরওয়া” কিতাবে স্বয়ং যে রকম বর্ণনা করেছেন, উহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাঁর জ বানীতে শ্রবণ করবার অনুরোধ করছি।

তিনি অত্যন্ত দুর্বল এবং পরিশ্রান্ত অবস্থায় খাজা ওসমান হারুনী (রঃ) এর খানকায় উপস্থিত হন।

হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) যেন বহুকাল অবধি এই অমূল্য রত্নের প্রতিক্ষায় ছিলেন। তিনি খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী (রঃ)-কে বরণ করে নেন।

তিনি লিখেছেন যে, “এই ফকির যখন বাগদাদে অবস্থিত হযরত জোনাইদ বোগ্দাদী (রঃ) মসজিদে উপস্থিত হই, তখন হজরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ) এর খেদমতে বহু দরবেশ উপস্থিত ছিলেন।

আমার অন্তরে তাঁর হস্তে মুরীদ হবার প্রবল বাসনা জাগরিত হইছিল। এমতাবস্থায় তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, যাও, ওজু করে দুই রাকাত নামায আদায় কর। আমি তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম।

তৎপর তিনি বললেন কেবলা মুখো হয়ে “সূরা বাকারা” পাঠ কর। আমি উহা পাঠ করলাম। সেরকম অবস্থায় আদেশ দিলেন “২১ বার দরুদ শরীফ” পাঠ কর। আমি দরুদ শরীফ পাঠ করলাম। অতঃপর আমার হস্ত ধারণ পূর্বক উর্ধ্বমুখী হয়ে দরবারে এলাহীতে আমার অনুকূলে দোয়া করলেন। মোনাজাত সমাপ্ত করে কাঁচি দ্বারা স্বহস্তে আমার শির মুগুন করে দেন। এর অব্যবহিত পরে আমার শিরোপরে ৪ তরিকতের নিদর্শন পরায়ে দেন।

তৎপর তিনি বললেন “এক হাজার মর্তবা দরুদ শরীফ পাঠ কর। আমি দরুদ শরীফ পাঠ করলাম। দরুদ পাঠ খতম হলে পরে বললেন “যাও অদ্য দিবা রাত্র আল্লাহর ধ্যানে মশগুল থাক। কারণ এটা আমাদের চিশ্তীয়া তরিকার আমোঘ বিধান।”

উক্ত আদেশ পালনের পরের দিন, হযরতের খেদমতে হাজির হবার পরে, আমাকে বললেন “আসন গ্রহণ কর।” আমি অত্যন্ত সন্ত্রমের সাথে আসন গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে করলেন, উপরের দিকে তাকাও এবং বল কতদূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

আমি নির্দেশানুযায়ী উর্ধ্বমুখী দৃষ্টিপাত পূর্বক বললাম, আমি “আরশে মোআল্লা” পর্যন্ত দেখতেছি। অতঃপর তিনি বললেন “নিচের দিকে তাকাও এবং বল কতদূর পর্যন্ত দেখতেছ।” আমি নিম্নে দৃষ্টিপাত করে বললাম “তাহা তাছারা” পর্যন্ত দেখতেছি।

তৎপর তিনি আদেশ করলেন “এক হাজার বার সূরা এখলাস পড়।” আমি তা পাঠ করলাম। তিনি পুনরায় বললেন, “উপরের দিকে তাকাও এবং বল কি কি তোমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে? উপরের দিকে তাকিয়ে বললাম “গোলাম হেযাবে আজমত” পর্যন্ত দেখতেছি। তিনি বললেন চক্ষুদ্বয় মুদে রাখ। আমি অনুরূপ করলাম।

তৎপর বললেন, চক্ষু উন্মোচন কর। উক্ত নির্দেশ পালনের অব্যবহিত পরে আমার পীর মুর্শীদ স্বীয় হস্ত মোবারকের এক জোড়া আঙ্গুলি দর্শন করিয়ে বললেন, “আঙ্গুলদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ কর এবং বল কিছু লক্ষ্য করতে সক্ষম হচ্ছ কিনা। আমি শাইখের আঙ্গুলদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম এখন স্রষ্টার আঠার হাজার সৃষ্টিজগত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

অতঃপর তিনি অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে আমাকে উদ্দেশ্য করে ফরমালেন সমুদয় প্রশংসার মালিক ও দাবীদার আল্লাহ। এখন তোমার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি সামান্য ব্যবধানে একখানা ইটের দিকে লক্ষ্য করে আমাকে বললেন “উক্ত ইটের তলায় সামান্য স্বর্ণ মুদ্রা আছে উহা সংগ্রহ পূর্বক অভাব গ্রস্তগণের মধ্যে সদকা হিসেবে বন্টন করে দাও।” আমি পরমানন্দে তা সম্পন্ন করলাম।” উক্ত বর্ণনা হতে এটাই প্রমানিত হয় যে, খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশ্তী (রঃ) মাতৃগর্ভ হতেই ওলী হিসেবে ধরাপৃষ্ঠে আগমন করেন। পীর ও মুর্শীদ স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে মারফতের শত স্তর অতিক্রম করিয়ে মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছিয়ে দিলেন।

## পীর ও মুর্শীদের সেবায় খাজা সাহেব (রঃ)

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ)কে শিষ্যত্বে বরণ করার পর হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ) ফরমালেন যে, “মঈনুদ্দীন এখন হতে আমার নিকট অবস্থান করবে।”

কোন কোন লেখকের মতে আড়াই বৎসর, ভিন্ন মতে ২০ বৎসর তিনি পীর সাহেবের সান্নিধ্যে অবস্থান করেছিলেন।

একদা তিনি খোরাসানের এক নির্জন পাহাড়ে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন অবস্থায় গায়েব হতে পীর দস্তগীর ওলীকুল শিরোমনি হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ) এর কণ্ঠ শ্রবণ করেছিলেন যে, “সমুদয় ওলীগণের ঘাড়ের উপর আমার পা।” উক্ত শব্দ শুনে সঙ্গে সঙ্গে খাজা সাহেব গর্দান নোয়ায়ে বললেন “জনাব, আপনার পদদ্বয় আমার মস্তকের উপর।”

## পীর ও মুর্শীদ সমভিব্যাহারে আল্লাহর ঘর ক্লাবা শরীফে গমন

খাজা সাহেব আধ্যাত্মিক জ্ঞানে গভীরতা লাভের পর স্বীয় মুর্শীদের সহগামী হয়ে হজ্ব করবার মানসে মক্কা শরীফে গমন করেন। ক্লাবা শরীফ তাওয়াক্ফ সমাপ্ত হবার পর স্বীয় মুর্শীদ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী, (রঃ)কে নিকটে আহ্বান করে হস্ত ধারণ পূর্বক “মিজাবে রহমত” (দোয়া কবুল হবার বিশেষ স্থান) এ দাওয়ায়মান হয়ে খোদার দরবারে, তাঁর অনুকূলে দোয়ারত অবস্থায় গায়েব হতে আওয়াজ এলো “আমি তোমার দোয়া কবুল পূর্বক, মঈনুদ্দীনকে আমার সান্নিধ্যবান ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম”।

অতঃপর হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) এর সহযাত্রী হয়ে তিনি হজুর পাক (দঃ) এর দরবারে উপস্থিত হন। উভয়ে মসজিদে নববীতে নামায আদায় করার পর হারুনী (রঃ) মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ)কে উদ্দেশ্য করে বললেন “হযুরের দরবারে সালাম পেশ কর” পীরের উপদেশ বাণী শ্রবণ করে হজুরে

আকরম (দঃ)এর দরবারে সালাম ও জেয়ারত পূর্বক আল্লাহর আরাধনায় মগ্ন হয়ে পড়লেন।

নিশীথ রাতে তন্দ্রাভাবাপন্ন অবস্থায় হযুর পুরনুর (দঃ) খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ)কে ফরমালেন, “হে মঈনুদ্দীন, পীরের অনুমতি সংগ্রহ করে হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা কর।”

এ প্রসঙ্গে কোন কোন লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন যে, পরের দিন ফজরের নামায আদায়ের পরে মসজিদে নববীর প্রধান সেবক ছাদের উপরে দণ্ডায়মান হয়ে উপস্থিত জনগণকে আহ্বান করে বলেন যে, “মঈনুদ্দীন উপস্থিত হউন”। উক্ত বাক্য শ্রবণের পরে পৃথিবীর যত মঈনুদ্দীন উপস্থিত ছিল সবাই খাদেম সাহেবের নিকট জড় হয়েছিল। বেগতিক অবস্থা অবলোকন করে খাদেম সাহেব সমস্ত মঈনুদ্দীন সাহেবানকে সেই দিনকার মত প্রস্থান করতে অনুরোধ করলেন।

পরের দিন ফজরের নামায আদায়ের পর পূনর্বীর উচ্চস্বরে খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী নামক ব্যক্তিকে আহ্বান করাতে খাজা সাহেব খাদেম সাহেবের নিকট উপস্থিত হন।

প্রবাদ আছে যে, হযুর (দঃ) তৎমুহূর্তে একটি আনার প্রদান করে “হিন্দুস্থান” যাবার নির্দেশ প্রদান করেন। খাজা সাহেব পর দিন প্রত্যুষে উপরোক্ত ঘটনাবলী সবিস্তারে হজরত ওসমান হারুনী (রঃ) এর নিকট বর্ণনা করলে স্বীয় শিষ্যের অকল্পনীয় সাফল্যের জন্য অত্যন্ত উৎফুল্লচিত্তে করুণাময়ের দরবারে শোকরিয়া আদায় করেন এবং এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) তদীয় প্রাণপ্রিয় মুরীদ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশ্তী (রঃ)কে খেলাফত প্রদান করেন।

হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) তাঁর পীর ও মুর্শীদ হতে প্রাপ্ত উপহারাদী যথা পাগড়ী, জুব্বা (আলখাল্লা) যষ্ঠি এবং পাদুকা ইত্যাদি খাজা সাহেবকে অর্পণ করে বললেন, “উক্ত বস্তু সমূহ আমার পীর

ও মুর্শীদ দান করেছিলেন। এ পবিত্র আমানত সমূহ আমি তোমার হস্তে অর্পণ করতেছি। তুমি যাকে উপযুক্ত মনে করবে, উক্ত অমূল্য বস্তু সমূহ তাকে দান করবে।

তৎপর হারুনী (রঃ) তরিকতের নিদর্শন প্রদান পূর্বক খাজা সাহেবকে এর গুড় তত্ত্ব বুঝিয়ে দেন।

খাজা সাহেব স্বীয় মুর্শীদ হারুনী (রঃ)কে বললেন “হযুর, আমি হিন্দুস্থানের রাস্তা এবং যান-বাহন সম্বন্ধে অজ্ঞ, আমার কি করা উচিত? উক্ত বাক্য শ্রবণের পরে হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) বললেন “চক্ষু বন্ধ কর এবং হিন্দুস্থানের যাত্রা পথ পরিচয় করে নাও। তোমার দুর্বলতা আমি পূর্বেই হৃদয়ঙ্গম করেছি”।

ভিন্ন মতে দেখা যায় যে, হজুর (দঃ) স্বয়ং খাজা সাহেবকে হিন্দুস্থানের যাত্রা পথ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দান করেছিলেন।

যা হোক পরবর্তী কালে তিনি উক্ত নকশা অনুযায়ী হিন্দুস্থান আগমণ করেছিলেন বলে প্রকাশ। হজ্জ সমাপনান্তে স্বীয় মুর্শীদ সমভিব্যাহারে পুনরায় বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) এর নিকট হতে যখন খেলাফত প্রাপ্ত হন তখন তার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর।

একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, তাঁর খেলাফত লাভের সময়কাল সম্পর্কে লেখকগণের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ লক্ষণীয় যে, তিনি হযরত হারুনী (রঃ) এর হস্তে মুরীদ হবার স্বল্প সময়ের ব্যবধানে খেলাফত লাভ করেন। এর স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, পীর সাহেব স্বীয় মুরীদগণকে খেলাফত দানের সময় ছদকা দান করবার আদেশ দান করেন। হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) এর নির্দেশানুক্রমে খাজা সাহেব ইস্টকের নিচ হতে স্বর্ণ মোহর উঠায়ে ছদকা দান করেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করা যায় যে, শিষ্যত্ব গ্রহণের আড়াই বছর পরে স্বীয় পীর হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) এর সহযাত্রী হয়ে হজ্জ সমাপন উপলক্ষে ক্বাবা শরীফে ২৮ দিন অবস্থান করেন। উক্ত সময়ে হযরত হারুনী (রঃ) প্রাণাধিক প্রিয় মুরীদ খাজা (রঃ)কে মারেফতের সমুদয় স্তর অতিক্রম করিয়ে খেলাফত প্রদান করেন।

তৃতীয়তঃ বিভিন্ন বর্ণনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পুনর্বীর হজ্জে গমন করলে হজুর (দঃ)-এর নিকট হতে হিন্দুস্থান যাত্রার আদেশ প্রাপ্ত হন। উক্ত সময়ে হযুর (দঃ) খাজা (রঃ)কে একটি আনার ফল এবং হিন্দুস্থানে যাত্রার মানচিত্র প্রদান করেন। উক্ত সময়ে তিনি খেলাফত প্রাপ্ত হন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। (আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত)।

### ওলী আল্লাহগণের দরবারে আতায়ে রসূল খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)

খাজা মঈনুদ্দীন হাসান চিশতী সঞ্জরী (রঃ) হিন্দুস্থান আগমনের প্রারম্ভে বহু সংখ্যক প্রসিদ্ধ ওলী আল্লাহগণের দরবারে এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী ব্যক্তি বর্গের মাজারে জেয়ারত ও অবস্থানের মাধ্যমে অবর্ণনীয় ফয়েজ (অনুগ্রহ) লাভ করেন। খাজা সাহেবের প্রথম খলিফা কুতুবুল আকতাব হযরত খাজা বখতেয়ার কাকী (রঃ) কর্তৃক রচিত “দলীলুল আরেফীন” নামক কেতারে বিভিন্ন প্রকার আলোচনার মাধ্যমে হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) এর নিকট হতে বিদায়কালীন ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পরিসর বৃদ্ধির ভয়ে এর আলোচনা থেকে বিরত রইলাম।

### বাগদাদ শহরে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)

আতায়ে রসূল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বাগদাদ শহরে অবস্থান কালে বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ ঘটে। উক্ত শহরে তিনি হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ) এর নিকট মুরীদ হন। উপরন্তু ঐ শহরেই তাঁর

প্রিয়তম প্রথম খলিফা কুতুবুল আক্‌তাব হযরত খাজা বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) তাঁর হস্তে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উক্ত বাগদাদ নগরীতে পীরানে পীর দস্তগীর হযরত শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) নিকট হতে অবর্ণনীয় অনুগ্রহ (ফয়েজ) লাভ করেন। তাছাড়া হযরত আবু নাসের সোহরোয়াদী (রঃ) শাইখুল মশায়েখ হযরত শাহাবুদ্দীন সোহরোয়াদী হযরত খাজা ওয়াহেদ উদ্দীন কিরমানী (রঃ) প্রমুখ খ্যাতি সম্পন্ন ওলী আল্লাহগণের সম্পর্শে অবস্থান করে প্রভূত জাহেরী এবং বাতেনী জ্ঞান লাভ করেন। উল্লেখ আছে যে, আতায়ে রসূল হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) লাগাতার ৫ মাস গৌছুল আযম দস্তগীর (রঃ) এর সহচর্ষে অবস্থান করেন। তাপস প্রবরদয় ৫৭ দিন একই হুজুরায় অবস্থান করেন। উক্ত সময়ে উভয় মহাতাপসের মধ্যে কি পরিমাণ ভাবের বিনিময় হয়, আল্লাহতাআলা ব্যতীত অপর কেউ অনুমান করা দুরূহ। তাছাড়া বড়পীর সাহেব, লাহোরে দাতা গঞ্জ বখশ্‌কে সিংহশাবক আখ্যায়িত করে খাজা সাহেবকে সাবধান করেছিলেন। তিনি তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ ওলীয়ে কামেল শেখ নজমুদ্দিন কিব্রীয়া (রঃ) এর সান্নিধ্যেও আড়াই বৎসর অতিবাহিত করেন।

হামাদান এবং তাবরীজ সফরে আতায়ে রসূল খাজা

মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ)

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রঃ) হামাদানের সুফীয়ে কামেল হযরত শেখ আবু ইউসুফ হামদানী (রঃ) এবং তাবরীজের সুপ্রসিদ্ধ ওলীয়ে কামেল শেখ আবু সাঈদ (রঃ) এর নিকট হতেও মারেফাতের জ্ঞান অর্জন করেন। উক্ত তাপস প্রবর সাহেবে কাশফ এবং কারামতের জন্য খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। উভয় তাপস প্রবরের সান্নিধ্যে অবস্থান করে খাজা সাহেব অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

ইস্পাহান এবং ইস্তুরাবাদে খাজা মঈনুদ্দীন  
হাসান চিশ্‌তী (রঃ)

হামাদান এবং তাবরীজে অবস্থানের পরে তিনি ইস্পাহানে গমন করেন। তৎকালীন ইস্পাহানের সুপ্রসিদ্ধ দরবেশ শেখ মাহমুদ ইস্পাহানী (রঃ) এর সম্পর্শে এবং খাজা আবুল হোসেন খারকানী (রঃ) এর মাজার জেয়ারতের মাধ্যমে বিস্তর রুহানী ফয়েজ অর্জন করেন।

হেরাত সফরে খাজা সাহেব

ইস্তুরাবাদ হতে হেরাত পৌঁছে তথায় শায়খুল ইসলাম হজরত আবদুল্লাহ আনসারী (রঃ) এর মাজার জেয়ারত করে এবাদতে এলাহীতে মগ্ন হয়ে পড়েন। স্বল্প সময়ের মধ্যে খাজা সাহেবের বুজুর্গীর আত্ম প্রকাশ ঘটে। চতুর্দিক হতে অসংখ্য জনসমগম হতে লাগল। অনন্যোপায় হয়ে তথা হতে প্রস্থান করে “সবজাদারে” গমন করেন। যে সময়ে তিনি “সবজাদারে গমন করেন, সে সময় “সবজাদারের হাকিম ছিলেন একজন দুশ্‌চরিত্রবান লোক। তাঁর বদ মেজাজ এবং এক রোখা স্বভাবকে সবাই ভয় করত। তাঁর অভিসারের নিমিত্তে একখানা মনোমুগ্‌ধকর বাগান ছিল। ঘটনাক্রমে খাজা সাহেব একজন খাদেম সমেত উক্ত বাগানে বিশ্রাম করার মানসে, একটি পানীয় জলের কুয়ার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করেন। তথায় তিনি আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন। বাগানের মালিগণ হাকিমের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে খাজা সাহেবের নিকেট এসে অত্যন্ত সম্মানের সাথে হাকিমের আচরণ সম্বন্ধে অবহিত করে তাঁদের অন্যত্র গমন করার জন্য সকাতরে অনুরোধ জ্ঞাপন করতে লাগল। কেননা হাকিম সাহেব বাগানে আগমণ করে উক্ত স্থানে দরবেশ সাহেবকে দর্শন করা মাত্র তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন এবং তাদের হেস্তনেস্ত করবেন।

খাজা সাহেব তদুত্তরে বললেন “দরবেশ কোন স্থানে আসন গ্রহণ

করার পরে উক্ত স্থান হতে সহজে প্রস্থান করে না।”

ইত্যবসরে হাকিম সাহেব সদলবলে বাগানে প্রবেশ করে তার নির্ধারিত আসনের পার্শ্বে মলিন বেশধারী একজন দরবেশকে দর্শন করে। অগ্নিশর্মা অবস্থায় খাজা সাহেবের নিকট গমন পূর্বক কিছু বলতে উদ্যত হলে, খাজা সাহেব অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে হাকিম সাহেবের প্রতি নজর দিলেন। হাকিম সাহেবের অনুরূপ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সহ্য করার মত ক্ষমতা ছিলনা বিধায়, তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়ে।

হাকিম সাহেবের শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করে খাজা সাহেব স্বীয় খাদেমকে এক পেয়ালা পানি আনতে নির্দেশ দিলেন। খাদেম পানি এনে খাজা সাহেবের হস্তে প্রদান করলে তিনি উক্ত পানি হাকিম সাহেবের শরীরে ছিটায় দেয়। কিয়ৎক্ষণ পরে হাকিম সাহেবের জ্ঞান ফিরে আসলে খাজা সাহেবের চরণে লুটিয়ে পড়ে এবং গর্হিত আচরণের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করলে খাজা (রঃ) তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন। অতঃপর হাকিম সাহেব-তার নিকট মুরীদ হয়ে খাদেমগণের অন্তর্ভুক্ত হন।

উক্ত অলৌকিক ঘটনার পরে হাকিম সাহেব পার্থিব জগত হতে মোহমুক্ত হয়ে উক্ত বাগান খাজা সাহেবকে নজরানা হিসেবে দান করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে তদুত্তরে তিনি বলেন “অসদুপায়ে অর্জিত উক্ত সম্পদ প্রাজ্ঞ মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ কর”। উক্ত সময়ে হাকিম সাহেবের অনুকরণে বহু সংখ্যক ব্যক্তি খাজা সাহেবের হস্তে মুরীদ হন। মুরীদ হবার পরে হাকিম সাহেব সমস্ত চাকর-চাকরাণীগণকে অব্যাহতি দিয়ে সমুদয় সম্পদ পূর্ব মালিকগণদের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন।

অতঃপর পরবর্তী হায়াত তিনি খাজা সাহেবের সেবায় কাটান। খাজা সাহেবের কৃপা দৃষ্টির ফলে পরবর্তীতে তিনি মারফতের উচ্চ স্তরে পৌছে খেলাফত প্রাপ্ত হন।

অতঃপর খাজা মইনুদ্দীন হাসান চিশতী (রঃ) “খেসার” নামক স্থানে

গমন করেন। তথায় সল্পকাল অবস্থান করে “বলখে” গমন করেন।”

উক্ত সময়ে “বলখের হাকিম মৌলানা জিয়াউদ্দীন নামে একজন দাঙ্গিক প্রকৃতির প্রসিদ্ধ আলেম বসবাস করতেন। অপর দিকে তিনি বিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদও ছিলেন। তিনি ফকির দরবেশগণকে অত্যন্ত হয়ে করতেন এবং অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। তাঁর শিষ্যগণকেও স্বীয় মনোভাবাপন্ন করে গড়তে সচেষ্ট ছিলেন। খাজা সাহেব সব সময় শিকারের সরঞ্জাম সঙ্গে রাখতেন এবং জনমানবহীন বিরান এলাকা পছন্দ করতেন। অভ্যাস বশতঃ একদা তিনি বলখের জঙ্গল হতে একটি কলঙ্গ পাখী শিকার করে খাদেমকে উহার কাবাব প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে হাকিম জিয়াউদ্দীন সাহেব ভ্রমণপথে খাজা সাহেবের নিকটবর্তী হলে স্বীয় খাদেমকে উক্ত পাখীর একখানা পা পুদান করার জন্য আদেশ দিলেন। মৌলানা সাহেব দ্বিধারোধ না করে উক্ত পাখীর কাবাব ভক্ষণ করে ফেললেন। অল্পক্ষণ পরে মৌলানা সাহেব অনুভব করলেন যে, তাঁর হৃদয়ে মনস্তত্ত্ব বিদ্যার লেশ মাত্রও অবশিষ্ট নাই। এ অভূতপূর্ব ঘটনায় তিনি এতই অভিভূত হলেন যে, ততক্ষণাৎ খাজা সাহেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে মুরীদ হয়ে গেলেন এবং তাঁর মনস্তত্ত্ব বিষয়ক কেতাবাবলী সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে দিলেন। উল্লেখ্য যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি খাজা (রঃ) এর নিকট হতে খেলাফত প্রাপ্ত হন।

### বলখ হতে গজনী অভিযুক্ত খাজা সাহেব

খাজা সাহেব বলখ হতে গজনীতে গমন করেন। গজনীর সুলতান মাহমুদ পরলোক গমন করার পর গজনীর শাসন ব্যবস্থায় অত্যন্ত বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়। খাজা সাহেবের উপস্থিতিতে সুলতান আলাউদ্দীন ঘোরী গজনী আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত বরফ বর্ষণের ফলে তিনি প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। বার বছর তাতারীগণ প্রবল বিক্রমে গজনী আক্রমণ করে শাসন ক্ষমতা অধিকার করে নেয়। পরে অবশ্য সুলতান স্বীয় রাজত্ব পুনর্দখল করে নেন।

করার পরে উক্ত স্থান হতে সহজে প্রস্থান করে না।

ইত্যবসরে হাকিম সাহেব সদলবলে বাগানে প্রবেশ করে তার নির্ধারিত আসনের পাশ্বে মলিন বেশধারী একজন দরবেশকে দর্শন করে অগ্নিশর্মা অবস্থায় খাজা সাহেবের নিকট গমন পূর্বক কিছু বলতে উদ্যত হলে, খাজা সাহেব অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে হাকিম সাহেবের প্রতি নজর দিলেন। হাকিম সাহেবের অনুরূপ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সহ্য করার মত ক্ষমতা ছিলনা বিধায়, তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়ে।

হাকিম সাহেবের শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করে খাজা সাহেব স্বীয় খাদেমকে এক পেয়ালা পানি আনতে নির্দেশ দিলেন। খাদেম পানি এনে খাজা সাহেবের হস্তে প্রদান করলে তিনি উক্ত পানি হাকিম সাহেবের শরীরে ছিটায় দেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হাকিম সাহেবের জ্ঞান ফিরে আসলে খাজা সাহেবের চরণে লুটিয়ে পড়ে এবং গর্হিত আচরণের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করলে খাজা (রঃ) তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন। অতঃপর হাকিম সাহেব তাঁর নিকট মুরীদ হয়ে খাদেমগণের অন্তর্ভুক্ত হন।

উক্ত অলৌকিক ঘটনার পরে হাকিম সাহেব পার্থিব জগত হতে মোহমুক্ত হয়ে উক্ত বাগান খাজা সাহেবকে নজরানা হিসেবে দান করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে তদুত্তরে তিনি বলেন “অসদুপায়ে অর্জিত উক্ত সম্পদ প্রাজ্ঞ মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ কর”। উক্ত সময়ে হাকিম সাহেবের অনুকরণে বহু সংখ্যক ব্যক্তি খাজা সাহেবের হস্তে মুরীদ হন। মুরীদ হবার পরে হাকিম সাহেব সমস্ত চাকর, চাকরাণীগণকে অব্যাহতি দিয়ে সমুদয় সম্পদ পূর্ব মালিকগণদের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন।

অতঃপর পরবর্তী হায়াত তিনি খাজা সাহেবের সেবায় কাটান। খাজা সাহেবের কৃপা দৃষ্টির ফলে পরবর্তীতে তিনি মারফতের উচ্চ স্তরে পৌছে খেলাফত প্রাপ্ত হন।

অতঃপর খাজা মইনুদ্দীন হাসান চিশতী (রঃ) “খেসার” নামক স্থানে

গমন করেন। তথায় সল্পকাল অবস্থান করে “বলখে” গমন করেন।

উক্ত সময়ে “বলখের হাকিম মৌলানা জিয়াউদ্দীন নামে একজন দাঙ্গিক প্রকৃতির প্রসিদ্ধ আলেম বসবাস করতেন। অপর দিকে তিনি বিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদও ছিলেন। তিনি ফকির দরবেশগণকে অত্যন্ত হয়ে করতেন এবং অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। তাঁর শিষ্যগণকেও স্বীয় মনোভাবাপন্ন করে গড়তে সচেষ্ট ছিলেন। খাজা সাহেব সব সময় শিকারের সরঞ্জাম সঙ্গে রাখতেন এবং জনমানবহীন বিরান এলাকা পছন্দ করতেন। অভ্যাস বশতঃ একদা তিনি বলখের জঙ্গল হতে একটি কলঙ্গ পাখী শিকার করে খাদেমকে উহার কাবাব প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে হাকিম জিয়াউদ্দীন সাহেব ভ্রমণপথে খাজা সাহেবের নিকটবর্তী হলে স্বীয় খাদেমকে উক্ত পাখীর একখানা পা প্রদান করার জন্য আদেশ দিলেন। মৌলানা সাহেব দ্বিধারোধ না করে উক্ত পাখীর কাবাব ভক্ষণ করে ফেললেন। অল্পক্ষণ পরে মৌলানা সাহেব অনুভব করলেন যে, তাঁর হৃদয়ে মনস্তত্ত্ব বিদ্যার লেশ মাত্রও অবশিষ্ট নাই। এ অভূতপূর্ব ঘটনায় তিনি এতই অভিভূত হলেন যে, ততক্ষণাৎ খাজা সাহেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে মুরীদ হয়ে গেলেন এবং তাঁর মনস্তত্ত্ব বিষয়ক কেতাবাবলী সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে দিলেন। উল্লেখ্য যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি খাজা (রঃ) এর নিকট হতে খেলাফত প্রাপ্ত হন।

### বলখ হতে গজনী অভিমুখে খাজা সাহেব

খাজা সাহেব বলখ হতে গজনীতে গমন করেন। গজনির সুলতান মাহমুদ পরলোক গমন করার পর গজনির শাসন ব্যবস্থায় অত্যন্ত বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়। খাজা সাহেবের উপস্থিতিতে সুলতান আলাউদ্দীন ঘোরী গজনী আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত বরফ বর্ষণের ফলে তিনি প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। বার বছর তাতারীগণ প্রবল বিক্রমে গজনী আক্রমণ করে শাসন ক্ষমতা অধিকার করে নেয়। পরে অবশ্য সুলতান স্বীয় রাজত্ব পুনর্দখল করে নেন।

উক্ত সময়ে মুসলমানগণের চরম দুর্দশা লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) গজনী ত্যাগ করে হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করেন।

### হিন্দুস্থানে আতায়ে রসূল খাজা মঈনুদ্দীন হাসান চিশ্তী সঞ্জরী (রঃ) এর আগমন

খাজা সাহেবের হিন্দুস্থান আগমনকে কেন্দ্র করে লেখক সমাজে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন কেতাবের মধ্যে খাজা (রঃ) এর হিন্দুস্থানে আগমনের তারিখের ব্যাপারে মত পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

তাওয়ারিখে ফেরেস্টা, মঈনুল আর্ওয়াহ কেতাবাদীতে উল্লেখিত আছে যে, তিনি সর্বমোট চারবার হিন্দুস্থানে আগমন করেছিলেন।

প্রথমবার- ৫৬১ হিজরী সনে, ২য় বার ৫৮৭ হিজরী সনে তিনি হিন্দুস্থান আগমন করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। আবার দেখা যায় যে, ৬০২ হিজরী সনে তিনি ২য় বার হিন্দুস্থানে আগমন করেছিলেন।

তাজকারাতে নাসেরী, মুনতেখাবুত তাওয়ারীখ, এবং ইণ্ডিয়া অব আওরঙ্গজেব নামক পুস্তকাবলীতে উল্লেখ আছে যে, পৃথ্বীরাজের পরাজয় বরণের পরে সুলতান শাহবুদ্দীন ঘোরীর সেনাবাহিনীর সঙ্গে তিনি আজমীর আগমন করেছিলেন।

“আমীরুল আওলীয়া, মিফতাহুত তাওয়ারীখ, আকবর নামা, সিররুল আকতাব, আখবারুল আখয়ার এবং আকারাতুল আক্রাম ইত্যাদি কেতাবাদিতে উল্লেখ আছে যে, ৫৮৭ হিজরী সনের ১১৯১ কিংবা ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে খাজা মঈনুদ্দীন হাসান চিশ্তী সঞ্জরী (রঃ) হিন্দুস্থানে আগমন করেছিলেন।

খাজা সাহেবের হিন্দুস্থানে আগমনের ৫৮৭ হিজরী সনকে

অত্যাধিক নির্ভরযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ পৃথ্বীরাজের গর্বিত মন্তক খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) এর ভারত অবস্থান কালে ভূতলে খসে পড়ে।

খাজা সাহেবের হিন্দুস্থান আগমনের পূর্ব হতে বহু খ্যাতনামা আলেম ও কামেল ব্যক্তিবর্গ এ উপমহাদেশে পদার্পণ করেছিলেন। যেমন লাহোরের আশেপাশে ও লাহোরে শেখ ইসমাইল বোখারী, হযরত আলি হুজ্বেরী দাতাগঞ্জ বখশ্ প্রমুখ মহাত্মাগণের তাবলীগের ফলে বিস্তর লোক হেদায়াৎ প্রাপ্ত হন।

এছাড়া বদায়ুন, কনৌজ, বিহার ইত্যাদি স্থানে মুসলমানদের বসবাস ছিল। কিন্তু খাজা সাহেবের হিন্দুস্থান আগমনের ফলে এ উপমহাদেশে অভূতপূর্ব সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি যখন হিন্দুস্থান আগমন করেন, তখন উপমহাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রায়ই উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের আয়ত্তাধীন ছিল। সমগ্র উপমহাদেশ ঘোর কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল।

জীব, জন্তু, পাথর, বৃক্ষলতা, পাহাড়, অগ্নি, ইদুর ইত্যাদির পূজার বহুল প্রচলন ছিল। তৎকালে জঘন্য বর্বরোচিত নরবলীর প্রথা প্রচলিত ছিল। মোদ্দা কথা, এ উপমহাদেশ ছিল শেরেক ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ।

সাধারণ ভাবে সবাই জ্ঞাত আছেন যে, খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) সোজা লাহোর হতে আজমীর আগমন করেছিলেন।

৫৮৭ হিজরী সনে তিনি লাহোরে আগমন করে হযরত মখদুম আলি হাজ্বেরী ওরফে “দাতা গঞ্জবখশ্” (রঃ) মাজারের সন্নিকটে একখানা হুজরায় ৪০ দিন “এতেক্বাফ” অবস্থায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকেন।

প্রবাদ আছে যে, হযরত আলি হাজ্বেরী (রঃ) দাতা গঞ্জ বখশ্ লকব্টি খাজা সাহেব কর্তৃক আখ্যায়িত উপাধি।

কিন্তু হযরত দাতা গঞ্জ বখশ্ (রঃ) কর্তৃক রচিত “কাশফুল আসরার” কেতাবে বর্ণনা করেছেন যে, জীবিত অবস্থায়ও লোকজন তাঁকে “গঞ্জবখশ্” নামে সম্বোধন করতেন। তাঁর শানে খাজা সাহেব একটি ফার্সী কাব্য রচনা করেছিলেন, যা জেয়ারত কারীগণকে অদ্যাবধি মোহিত করে।

### আজমীর অভিমুখে

#### হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশ্তী

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশ্তী (রঃ) কিছুদিন লাহোরে অবস্থান করার পর ৪০ জন দরবেশ সহ আজমীর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। তখনকার আজমীর ছিল হিন্দুগণের মহাতীর্থ স্থান। অসংখ্য মন্দির অধ্যুষিত আমজীরে তখন শত শত পূজারী ব্রাহ্মণ মন্দিরে নিয়োজিত ছিল। এক কথায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন একত্ববাদ বিরোধীদের প্রাণ কেন্দ্র আজমীরের দিকে যাত্রা শুরু করার মত দুঃসাহসের পশ্চাতে যে মহান শক্তি কাজ করেছিল, তা কেবল মাত্র আল্লাহর উপর অটল বিশ্বাস এবং ভরসা। তাঁর উক্ত যাত্রায় বিঘ্ন ঘটাবার মত সাহস এবং শক্তি ধরাতলে কারো ছিল না।

তিনি স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার ঐশী বলে বলীয়ান, সরকারে দোজাহান সর্ওরে কাউনাইন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কর্তৃক আশীর্বাদ পুষ্ট এবং আদেশ প্রাপ্ত হয়ে আজমীর অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। লাহোর হতে আজমীর আগমনের প্রাক্কালে সন্ধ্যা কালের জন্য তিনি দিল্লীতে অবস্থান করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে দিল্লীর অবস্থাও কুসংস্কারে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। তথ্য অবস্থানকালে তিনি সদলবলে আযান সহকারে ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন এবং অকুতোভয়ে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর তবলীগের ফলে বহু সংখ্যক বিধর্মী মুসলমান হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল।

দিল্লীর তৎকালীন সময়ের শাসক হতে শুরু করে সমস্ত বিধর্মীগণ তাঁর সমূহ ক্ষতি সাধনের জন্য নানা প্রকার ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তারা অকৃতকার্য হয়ে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে পশ্চাদাপসরণ করেছিল।

একদা একজন স্থানীয় বিধর্মী যুবক কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে গোপনে আস্তিনের নীচে একটি ছোরা নিয়ে খাজা সাহেবকে হত্যার মানসে তাঁর আস্তানায় উপস্থিত হয়। খাজা সাহেব অন্তঃদৃষ্টিতে যুবকের কুটিল মনোভাব জ্ঞাত হয়ে উক্ত যুবককে লক্ষ্য করে বললেন “হে যুবক তোমার অভিলাস পূর্ণ করে প্রস্থান কর।” যুবক খাজা সাহেবের উক্ত অলৌকিকতা দর্শনে লজ্জাবনত মস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা করে ইসলাম ধর্মের শীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কোন কোন লেখকের মতানুসারে খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) লাহোর হতে দিল্লী আগমনের প্রাক্কালে “সামানা” বর্তমান পানিপথ নামক স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করেছিলেন। স্থানীয় জনগণ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে খাজা সাহেব এবং তদীয় সাথী মহলকে সাদরে বরণ করে নেয়। কিন্তু উক্ত আন্তরিকতা ছিল খাদ্ময়। একদিন নিমন্ত্রনের আয়োজন করে তাদের হীন অভিলাস চরিতার্থ করার মানসে সদলবলে খাজা সাহেবকে দাওয়াত দিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল তদীয় সাথীগণ ও দরবেশকে একস্থানে সমবেত করে চিরকালের মত শেষ করে দেয়া। খাজা সাহেব অলৌকিক ভাবে কুচক্রীদের চক্রান্ত হৃদয়ঙ্গম করে সসম্মানে দলবল সহকারে পানিপথ হতে প্রস্থান করে অন্যত্র চলে যান। কথিত আছে যে, উক্ত ষড়যন্ত্রের মূল হোতা ছিল রাজা পৃথ্বী রাজ এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা তৎকালীন দিল্লীর প্রশাসক খাণ্ডে রাও।

#### আজমীরের বুকে খাজা সাহেব

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) যখন আজমীরে পদার্পণ করেন তখন চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজ অত্যন্ত দাপটের সাথে দিল্লী এবং

পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ আজমীর শাসন করতেন। সে অনেকটা হিন্দুস্থানের কেন্দ্রীয় শাসকের ন্যায় ছিল। তা ছাড়াও তার দাঙ্কিতার অন্য কারণও ছিল। সে তারৌড়ীর রণক্ষেত্রে সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘোরীর যোদ্ধাদলকে পরাজিত করেছিল।

গজনির তৎকালীন প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে সুলতান শাহাবুদ্দীন শাসনক্ষমতা হস্তগত করে হিন্দুস্থান বিজয়ের আকাঙ্ক্ষায় সর্বাত্মে লাহোর, ভাতিন্দা প্রভৃতি স্থান সমূহ বিজয়ের পরে, গজনী অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে গুপ্তচর কর্তৃক অবগত হলেন যে, পৃথ্বীরাজ এক দুর্জয় বাহিনী সমেত ভাতিন্দা দুর্গ পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে অগ্রসর হচ্ছে। সুলতান উক্ত অনাকাঙ্ক্ষিত বার্তাশ্রবণে রণক্লান্ত যোদ্ধাদলকে নিয়ে পুনরায় তারৌড়ীর রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হন। উক্ত যুদ্ধে সুলতানী বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত অপূরণীয় ক্ষয় ক্ষতির মাধ্যমে পারজয় বরণ করেন। এটা তারৌড়ীর রণক্ষেত্রে সুলতানের সাথে পৃথ্বীরাজের ১ম যুদ্ধ ছিল। তারৌড়ীর রণক্ষেত্রে সুলতান মারাত্মক ভাবে আহত হবার পরে তাঁর একজন খিলজী ক্রীতদাস স্বীয় অশ্বের উপর আরোহণ করায় অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে লাহোর নিয়ে যায়। জানা যায় যে, তিনি সুস্থ হবার পর রণক্ষেত্রে হতে পলায়নের জন্য স্বীয় যোদ্ধাদলকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেন। অগত্যা যুদ্ধ বিদ্ধান্ত সেনাদলকে নিয়ে তিনি গজনীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

### পৃথ্বীরাজের বক্ষস্থলে খাজা সাহেব

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) কেবলমাত্র ৪০ জন সাথী দরবেশ সমভিব্যাহারে আজমীরে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড ময়দানে উপস্থিত হয়ে তথায় অবস্থান গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, উক্ত ময়দানটি রাজা পৃথ্বীরাজের উষ্ট্র বহরের বিশ্রামস্থল ছিল। উষ্ট্রচালক “সতরবান” মুসলমান দরবেশগণকে দর্শন করে বিচলিত অবস্থায় খাজা সাহেবের নিকট গমন পূর্বক বলল, “এ ময়দানটি রাজার উষ্ট্র বহরের বিশ্রামস্থল, কাজেই এ

স্থান হতে আপনারা অন্যত্র প্রস্থান করুন। যদি আপনাদের উপস্থিতি এবং অবস্থান সম্বন্ধে রাজা জ্ঞাত হন, তাহলে আপনাদের আর রক্ষা থাকবেনা।”

খাজা সাহেব উষ্ট্র চালকগণকে বললেন “ভাই, রাজকীয় উষ্ট্র বহরের জন্য ময়দানে বিস্তর খালি জায়গা পড়ে রয়েছে।” কিন্তু উষ্ট্র চালকগণের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির দরুণ ক্ষুণ্ণ চিত্তে খাজা সাহেব বললেন, “আচ্ছা ভাই! আমরা প্রস্থান করতেছি। এ স্থানে সত্য এবং সত্যই রাজার উষ্ট্র বহর বিশ্রাম করবে।”

উক্ত বাক্য সমূহ বলে তিনি সদলবলে আনা সাগরের নিকটবর্তী স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর আদেশক্রমে খাদেমগণ তথায় একখানা কুঁড়ে ঘর প্রস্তুত করেন এবং উক্ত কুঁড়ে ঘরে তিনি আল্লাহর উপাসনায় মগ্ন হয়ে পড়েন। “সতরবান” গণ প্রতিদিনের কর্মসূচী অনুযায়ী উষ্ট্র বহর উক্ত ময়দানে রেখে বিশ্রাম করবার জন্য চলে গেল। পরদিন প্রত্যুষে ময়দানে আগমণ করে “সতরবান” গণ উষ্ট্র বহরকে আশ্রয় চেষ্টা করেও বিন্দুমাত্র হেলাতে সক্ষম হল না। মরু জাহাজ যেন অটল হয়ে আল্লাহর ওলীর মুখ নিঃসৃত বাক্যকে সত্যে পরিণত করার দৃঢ় প্রত্যয়ে যে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় স্থির হয়ে রইল। অবিরাম কসরত করেও যখন কোন প্রকার ফলোদয় হল না, তখন অনন্যপায় অবস্থায় “সতরবানগণ” ভগ্ন মনোরথে রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে রাজার নিকট সবিস্তারে দরবেশগণের সাথে তাদের কথোপকথনের বর্ণনা দিল।

রাজা পৃথ্বীরাজ সমস্ত কিছু শ্রবণের পর উষ্ট্র পরিচালকগণকে উপদেশ দিল যে, “নিশ্চয় এটা উক্ত দরবেশ দলের কারসাজি। তোমরা অনুনয় বিনয় করে দেখতে পার। হয়তো কার্যোদ্ধার হতে পারে।”

অতঃপর রাজার পরামর্শক্রমে উষ্ট্রচালকগণ খাজা সাহেবের আস্তানায় উপস্থিত হয়ে সকাতরে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলল, “মহাত্মন, আমরা সামান্য রাজকর্মচারী বিধায় রাজকোপালনের ভয়ে আপনাদের সাথে

খাজা গরীবে নেওয়াজ ৩৫

অন্যায় আচরণ করেছি। কৃত কর্মের জন্য আমরা অনুতপ্ত। অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের চলৎ শক্তি বিহীন উষ্ট্র বহরকে চলাফেরা করতে সক্ষম করে দিন। অন্যথায় রাজার ক্রোধাগ্নি হতে আমরা নিষ্কৃতি পাব না”।

উষ্ট্র পরিচারকগণের মিনতিতে এবং তাদের সঙ্গীন অবস্থা বিবেচনা করে সল্লক্ষণ মৌন অবস্থায় কাটিয়ে ফরমালেন “তোমরা যাও”, খোদার হুকুমে উষ্ট্র বহর চলৎ শক্তি ফিরে পেয়েছে।

অতঃপর “সতরবানগণ” উষ্ট্র বহরকে নিয়ে চারণ ভূমিতে চলে গেল। এটা ছিল আজমীরের বুকে গরীবে নেওয়াজের প্রথম কেরামত।

**আনা সাগরের তীরে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ)**

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) সাথী দরবেশগণকে নিয়ে আনা সাগরের অনতিদূরে আন্দর কোটের নিকটবর্তী স্থানে একখানা কুঁড়ে ঘরে অবস্থান গ্রহণ করে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন হয়ে পড়েন এবং দু'রাকাত শৌকরানা নামাজ আদায় করেন। প্রবাদ আছে যে, উক্ত কুঁড়ে ঘর একটি ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলে অবস্থিত ছিল।

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) যে স্থানটিতে সব সময় পাঞ্জেরানা নামাজ আদায় করতেন, তা বর্তমানে আউলিয়া মসজিদ নামে খ্যাত। তৎকালীন সময়ে আনা সাগরের চতুষ্পার্শ্বে বহু সংখ্যক বড় বড় মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত মন্দির সমূহে প্রত্যহ প্রদীপ জ্বালাবার জন্য কয়েক মণ তেল ব্যয় হত। কয়েকশত পূজারী ব্রাহ্মণ এবং কর্মচারী উক্ত মন্দির সমূহের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ছিল।

বিধর্মী অধ্যুষিত উক্ত আনা সাগরের সন্নিকটে অবস্থান করতঃ খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) ঐশী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে চরম প্রতিকুলতার মধ্যেও অত্যন্ত ধৈর্য এবং দৃঢ়তার সাথে তবলীগের কার্য সম্পাদন করেছিলেন। প্রত্যহ ৫ ওয়াজ আজানের সুরে আনা সাগরের নিকটবর্তী

খাজা গরীবে নেওয়াজ ৩৬

স্থান সমূহে আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করতেছিল। তাঁর সদাচরণ, অমায়িক এবং অলৌকিক ঘটনাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে অবর্ণনীয় প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অন্ততঃপক্ষে ২০ ব্যক্তি সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দিক্ষা লাভ করে।

**আজমীর অধিপতির কোপানলে খাজা গরীবে  
নেওয়াজ (রঃ)**

আল্লাহ তাআলা কোন ব্যক্তির প্রতি সদয় হলেই কেবলমাত্র তখনই উক্ত ব্যক্তির সংশোধিত হওয়া সম্ভব। স্রষ্টার রহদৃষ্টির আওতাধীন কোন ব্যক্তিকে সৎপথে আনয়নের কিংবা হিতোপদেশ দান করার চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা অত্যাধিক।

ধর্মীয় দৃষ্টিতে তৎকালীন আজমীর ছিল কুসংস্কারের জগদদল পাথরে নিষ্পেষিত। কুফরী এবং খৃষ্টান ধর্মের মত ভ্রান্ত মতাবলম্বীগণের কেন্দ্র ভূমি। আমজীরের জনগণ মুসলমানগণকে ম্লেচ্ছ, জবন অস্পৃশ্য ইত্যাদিতে আখ্যায়িত করত। আজমীর অধিপতি খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর আজমীর আগমণ এবং অবস্থানকে অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে করেছিল। আজমীরের বুকে মুসলমান দরবেশগণের অবস্থিতি তার হৃদয়ে অহরহ বেদনার উদ্বেক করতেছিল।

বিধর্মীরা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এবং তদীয় সাথী দরবেশগণকে হয়রানি করার কোনরূপ পস্থা অব্যবহৃত রাখে নি। কিন্তু প্রতিবারই তাদের খড়্গ তাদেরই কর্তন করতে উদ্যত হয়েছে।

পরম পুরাক্রমশালী মুসলমান বিদ্বেশী রাজা পৃথীরাজ, খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর আজমীর আগমণ এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ পূর্বক কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করে নাই। তবে বিভিন্ন রূপে কুটিলতা ও শঠতার আশ্রয় নিয়ে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ)কে অপদস্থ কিংবা আজমীর হতে বিতাড়িত করার

অপচেষ্টায় রত ছিল।

পৃথ্বীরাজের জননী অতিশয় বুদ্ধিমতি রমণী ছিল। গণনা বিদ্যায় পারদর্শিনী উক্ত মহিলা খাজা সাহেবের হিন্দুস্থান আগমনের বহু পূর্বে সাবধান করে তদীয় সন্তান রাজা পৃথ্বীরাজকে জ্ঞান দান করেছিল যে, “অচিরে তোমার রাজ্যে একজন মুসলামন দরবেশ আগমন করবেন। তাঁকে তুমি কস্মিনকালেও হয়রানি করবে না, কিংবা প্রস্থানে বাধ্য করবেনা। যদি এর ব্যতিক্রম কিছু কর, তাহলে তোমরা মস্তকে আর রাজমুকুট শোভা বর্ধন করবে না।”

কোন কোন লেখক লেখনীতে লক্ষ্য করা যায় যে, পৃথ্বীরাজ মাতার উক্ত সাবধান বাণী, শ্রবণে কুটুক্তি করে অত্যন্ত দাষ্টিকতার সাথে রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তে খাজা সাহেবের কাল্পনিক ছবি (মাতার বর্ণনানুযায়ী) অঙ্কন করায় প্রেরণ করেছিল। যাতে সীমান্ত রক্ষীগণ বা প্রশাসকগণ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

কথিত আছে যে, খাজা সাহেবের উক্ত কাল্পনিক ছবি এখনও প্রাচীন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কিছু সংখ্যক লোকের হস্তে বিদ্যমান আছে।

### গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর হস্তে রাজা পৃথ্বীরাজের নির্ভরশীল স্তম্ভের অভাবনীয় পতন

রামদেও (দেব) তৎকালীন আজমীর তথা সমগ্র হিন্দুস্থানের প্রথম শ্রেণীর পূজারী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অন্যতম ছিল। রামদেও (দেব)কে রাজা হতে আরম্ভ করে সমগ্র আজমীর বাসীগণ খুবই সমীহ করতো।

বিভিন্ন লেখকবৃন্দ রাম দেওকে পৃথ্বীরাজের নিকট বশ্যতা স্বীকার কারী জ্বীন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে একজন প্রভাবশালী যাদুকর ছিল। আজমীরের বিধর্মী জনগণ উক্ত পরাক্রমশালী রাম দেও এর নিকট গমন করে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) প্রতিকূলে নানা প্রকার সত্যমিথ্যা অভিযোগ আনয়ন পূর্বক ক্ষেপিয়ে তুলল। তারা

অত্যন্ত আবেগপূত কণ্ঠে বুঝাতে সক্ষম হল যে, খাজাসাহেব এবং তদীয় সাথীগণের দ্বারা তাদের ধর্মের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। উপরন্তু তাদের পূত পবিত্র মন্দির বেষ্টিত আনা সাগরের পানি ব্যবহার করে পানিকে অপ্পৃশ্য করে তুলতেছে। কাজেই যে কোন পন্থায় খাজা সাহেবকে সদলবলে আজমীরের ত্রিসীমানা হতে বের করে দিয়ে সনাতন ধর্ম রক্ষা করতে হবে।

রাজা পৃথ্বীরাজও রামদেও এর নিকট দূত মারফত সাহায্য ভিক্ষা করে বার্তা প্রেরণ করেছিল যে, খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ)কে জোর পূর্বক আজমীর হতে প্রস্থানে বাধ্য করা না হলে রাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

রামদেও সবাইকে অভয়দান পূর্বক অগ্নিশর্মা হয়ে খাজা সাহেবের আস্তানায় গমন করে। তথায় উপস্থিত হয়ে কিছু বলবার জন্য উদ্যত হলে, ধ্যানমগ্ন অবস্থা হতে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) একপলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

উক্ত অন্তর্ভেদী দৃষ্টির দরুণ রাম দেওএর সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী আত্মারাম পলায়ন করে তার হৃদয়ে যেন এক নবজাগরণের তাণ্ডব লীলার সৃষ্টি হল। একত্ববাদের উজ্জ্বল আলোকে দীপ্তমান হয়ে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে খাজা (রঃ) এর হস্তে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

রামদেও এর সঙ্গে আগত জনগণ অকল্পনীয় এ দৃশ্য অবলোকনের জন্য মানসিকভাবে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক ভগ্ন হৃদয়ে অত্যন্ত বিষন্ন মনে স্ব স্ব বাসগৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং অবশিষ্ট জনগণ রামদেও এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মুসলমান হয়ে যায়।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর গরীবে নেওয়াজ (রঃ) রামদেও এর নাম পরিবর্তন করে “সাদী দেও” নামে আখ্যায়িত করেন।

## শেষ সম্বল যোগী অজয় পালের সাহায্য ভিক্ষায় রাজা পৃথ্বীরাজ

আতায়ে রসূল গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশতী (রঃ) এর নিকট অলৌকিক আঘাতে জর্জরিত হয়ে রাজা পৃথ্বীরাজ অনন্যোপায় অবস্থায় যুগখ্যাত হিন্দুস্থানের অদ্বিতীয় ইন্দ্রজাল বিশেষজ্ঞ যোগী অজয় পালের শরণাপন্ন হল। পৃথ্বীরাজের ধারণা ছিল যে, খাজা সাহেব একজন যাদু বিশারদ। কাজেই অপর একজন যাদু বিদ্যায় পারদর্শী দ্বারা তাঁকে করায়ত্ত করা উত্তম বিবেচনা করে উক্ত পস্থা অবলম্বন করাই বিধেয় মনে করেছিল।

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ)কে সদলবলে আজমীর হতে বহিষ্কারের জন্য শেষ সম্বল হিসাবে অজয় পালের আগমনের প্রতীক্ষায় পৃথ্বীরাজ অত্যন্ত উদগ্রীব অবস্থায় কালযাপন করতে লাগল।

যোগী অজয়পাল তখন আজমীরের অনতিদূরে এক পাহাড়ে সাজ-পাজদের নিয়ে ঐন্দ্রজালীক সাধনায় রত ছিল।

রাজার আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করে অভয়দান পূর্বক তার দৃঢ় প্রত্যয়ের সংবাদ প্রেরণের মাধ্যমে রাজার তপ্ত হৃদয়কে সান্তনা দান করে আজমীর আগমনের তরে অজয় পাল প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। অবশেষে শুভ সন্ধিক্ষণে অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা করে পৃথ্বীরাজের মনোবাঞ্ছা পূরনার্থে যোগী আজমীর আগমন করে।

কিন্তু রাজা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে সক্ষম হননি যে, তিনি খাল কেটে স্বয়ং কুমীরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন। মানুষের অদৃষ্টে যা লেখা আছে তা অবশ্যই পূরণ হবে। অদৃষ্ট মন্দ হলে যে দিকে তাকাবে সে দিকেই অন্ধকার দৃষ্টিগোচর হবে।

আসুন পাঠক বর্গ, পৃথ্বীরাজের শেষ স্তম্ভের পতন কিভাবে ঘটেছিল তা একবার লক্ষ্য করুন। যোগী অজয় পাল ঐন্দ্রজালীক খেলা প্রদর্শনের মোক্ষম সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মহাসমারোহে বহু সংখ্যক শিষ্যগণকে সঙ্গে করে আজমীর অভিমুখে যাত্রা করল। মহান প্রভু আল্লাহতায়াল্লা অপরাপ দৃশ্যের অবতারণা করে রাজাকে হতাশ করার কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত করলামঃ

## ইন্দ্র-জালীক ভেলকীবাজীর মাধ্যমে যোগী অজয় পালের আজমীরে প্রবেশ

যোগী অজয় পাল যাদু মন্ত্র বলে পবনের সাহায্যে যোগাসনের সাথে হরিণের চামড়ার উপর এবং তার বহু সংখ্যক সাগুরেদ অগ্নি উদ্গীরিত সর্প হস্তে ব্যাস্ত্রের উপর আরোহণ করে যাদুর ঝড় সৃষ্টির মাধ্যমে মহাসমারোহে আজমীরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলে, আজমীরের আপামর জনসাধারণ তাদের সাদর সম্মাষণে বরণ করে নেয়। উপস্থিত জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ধরাতল কম্পন করে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর আস্তানার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

খাজা সাহেব কাশ্ফের সাহায্যে প্রিয় সাথীগণকে যোগী অজয় পালের আগমন বার্তা হতে আরম্ভ করে সমুদয় কাহিনী বিশ্লেষণ পূর্বক স্বীয় সাথীগণকে বেষ্টন করে চতুর্দিকে একটি বৃত্ত রেখা অঙ্কন করে দেন। তিনি সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, কোন অবস্থাতেই যেন তারা উক্ত বৃত্ত রেখার বাহিরে গমন না করে। অতঃপর খাজা সাহেব আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন।

অজয় পাল তার যাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে খাজা সাহেবের আস্তানার নিকটবর্তী হতে থাকলে দরবেশগণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। অজয় পালের অনুগামীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে নানা প্রকার যাদুর খেলা প্রদর্শন করতে করতে যখন খাজা সাহেব অঙ্কিত বৃত্ত রেখার নিকটবর্তী হল, তখন তাদের উক্ত যাদুর কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে

গেল। অজয় পাল বারে বারে অকৃতকার্য হবার কারণে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তার আয়ত্বে সমুদয় মন্ত্রাদি পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করল। অবশেষে যোগী যাদুর ঝড় সৃষ্টি করে। ধূলা-বালির কারণে গরীবে নেওয়াজ (রঃ) অতিষ্ঠ হয়ে একমুষ্টি ধূলা নিয়ে ফুঁক দিয়ে যাদুকরণের প্রতি নিষ্ক্ষেপ করা মাত্র তাদের কার্যকারিতা স্তব্ধ হয়ে গেল।

যোগী অজয় পাল যাদুর সমুদয় মন্ত্র প্রয়োগ করেও যখন খাজা সাহেব কিংবা তাহার সাথীগণের কেশাশ্র পরিমাণও ক্ষতি সাধন করতে পারল না, তখন তার আখেরী বাহাদুরী প্রদর্শনের মাধ্যমে আকাশের উপর হতে যাদুর অগ্নি শিলা বর্ষণের চিন্তা করে একখানা মৃগ চর্মের উপর আসন গ্রহণ পূর্বক পক্ষীর ন্যায় আকাশের দিকে উড়াল দিল।

গরীব নেওয়াজ (রঃ) ধ্যান হতে মস্তক উত্থাপন পূর্বক সাথী দরবেশগণকে জিজ্ঞাসা করলেন “অজয় পাল কত দূর উপরে উঠেছে”? তাঁরা বললেন, যেন একটি পাখী সদৃশ মনে হচ্ছে।

খাজা সাহেব স্বীয় পাদুকা জোড়া (খরম) উপরের দিকে নিষ্ক্ষেপ করে বললেন, “যাও অজয় পালকে ভুতলে নিয়ে এসো।”

আল্লাহতায়ালার প্রিয় পাত্র খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) পাদুকাদ্বয় খসিত তীরের ন্যায় ধাবিত হয়ে যোগী অজয় পালের মস্তকে ভীষণভাবে প্রহার করতে করতে তাকে জমিনে অবতরণ করতে বাধ্য করল। প্রবাদ আছে যে, উক্ত প্রহারের শব্দ ভূমিতে অবস্থানরত লোকজন শ্রবণ করেছিল।

অজয় পালের বোধোদয় হলো যে, খাজা (রঃ) যাদুগর নন বরং আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভকারী মহা তাপস ও কামেল ওলী।

ভূতলে অবতরণ করে অজয় পাল, খাজা সাহেবের নিকট স্বীয় কৃত অশোভনীয় আচরণের জন্য সন্মত ক্ষমা ভিক্ষা করলে দয়ার সাগর মানব হিতৈষী গরীবে নেওয়াজ (রঃ) তার সমুদয় অপরাধ মার্জনা করে

দেন।

অতঃপর যোগী অজয় পাল স্বীয় সনাতন ধর্মের অন্তঃসার গুন্যতা অনুভব করে ইসলাম ধর্মের গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করে খাজা (রঃ) এর হস্তে মুসলমান হয়ে যায়।

তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তদীয় বহু সংখ্যক শিষ্য সাম্য ও সত্য ধর্ম ইসলাম কবুল করে মুসলিম সমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

গরীবে নেওয়াজ (রঃ) অজয় পালের নাম পরিবর্তন করে “আবদুল্লাহ” নামে আখ্যায়িত করেন।

আবদুল্লাহ অতি অল্প সময়ের মধ্যে গরীবে নেওয়াজ (রঃ) সাহচর্যে ওলীয়ে কামেল হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি খাজা সাহেবের খলিফাগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

কথিত আছে যে, তিনি অমরত্ব লাভ করবার জন্য খোদার নিকট প্রার্থনা করতে অনুরোধ করায় খাজা (রঃ) তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে আল্লাহর নিকট দোয়া করাতে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। কাল কেয়ামত পর্যন্ত পথ হারা এবং পিপাসার্তগণকে পানি পান করাবার ব্রত নিয়ে লোক চক্ষুর অন্তরাল হয়ে যান। অদ্যাবদি তিনি উক্ত ব্রতে অটল রয়েছেন।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) খলিফাগণের মধ্যে আবদুল্লাহ বিয়াবাণী আখ্যায়িত ব্যক্তিই হিন্দুস্তানের যুগখ্যাত যাদুগির সাবেক যোগী অজয় পাল। সাবেক রামদেও (দেব) এবং যোগী অজয় পালের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে রাজা পৃথ্বীরাজের মানসিক অবস্থার দারুণ অবনতি ঘটে। উপরন্তু আজমীরের আপামর জনসাধারণ দলে দলে ইসলামের শীতল ছায়াতলে সমবেত হতে থাকে।

গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এক প্রকার নিষ্কটক অবস্থায় পূণ্যদমে তবলীগের কার্য সম্পন্ন করতে থাকেন।

### প্রতিশোধ স্পৃহায় পৃথ্বীরাজ

আতায়ে রসুল গরীবে নেওয়াজ হজরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশ্তী (রঃ) এর নিকট পৃথ্বীরাজের পরম আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ফলে আজমীর তথা পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহের জনমনে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যখন দলে দলে ইসলাম ধর্মে দাখেল হতে থাকে, তখন পৃথ্বীরাজের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়।

এ প্রসঙ্গে কিছু কথা প্রকাশ করলে হয়তো পাঠক বর্গের সম্পূর্ণ ঘটনাবলী সহজে বোধগম্য হবে। কোন কোন লেখকবৃন্দের লেখনীতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বর্তমান দরগাহ শরীফের স্থান রাম দেও (শাদী দেও) বা যোগী অজয় পাল আবদুল্লাহ বিয়াবানি (রঃ) কর্তৃক খাজা সাহেবের প্রতি নজরকৃত সম্পত্তি।

যখন দলে দলে লোকজন স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো। পৃথ্বীরাজের পক্ষে ক্রোধ সম্বরণ করা আর সম্ভব হল না। অদিকন্তু সাদী দেও ও আবদুল্লাহ বিয়াবানির ন্যায় যুগখ্যাত ব্যক্তিবর্গের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে রাজা পৃথ্বীরাজ আর স্থির থাকতে পারলো না।

নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তার বোধদয় না হওয়ায় সর্বশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে খাজা সাহেবকে সদলবলে আজমীর হতে বিতাড়িত করার মনস্থ করলো।

নানা প্রকার আনুসঙ্গিক কারণে রাজার মন মানসিকতার ব্যাপ্তি ঘটে। যেমন খাজা সাহেব আজমীর অবস্থান কালে রাজপুত্র “গোলা” মুসলমান যোদ্ধাগণকে পরাস্ত করে “ভাতিন্দার” দুর্গ পূর্ণদখল করেন।

হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্স রাজা পৃথ্বীরাজকে কেন্দ্রীয় শাসকের ন্যায় সমীহ করতো। জননীর আগাম বাণীকে উপেক্ষা করে রাজা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলো যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে খাজা সাহেবকে সদল-বলে আজমীর ত্যাগ করাবে।

ঐতিহাসিকগণ রাজার ধৈর্যচ্যুতির বর্ণনা বিভিন্নরূপে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন-

(ক) খাজা (রঃ) পৃথ্বীরাজকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

(খ) রাজার একজন অমুসলমান কর্মচারী মুসলমান হওয়ার কথা অবগত হয়ে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন করতে থাকায়, খাজা সাহেব রাজার নিকটে খবর পাঠিয়ে দিলেন যে, অন্যায় ভাবে কোন লোককে নির্যাতন করা প্রত্যেক ধর্মের বহির্ভূত বিধান।

(গ) একদা রাজা দুর্গের শীর্ষে আরোহণ করলে মুসলমানগণের এক বিরাট জামআত দর্শন করে। তাঁর জীবিত অবস্থায় স্বীয় রাজ্যে মুসলমানগণের এত বিরাট দল অমিত তেজে ধর্ম কর্ম সমাধান করে যাবে এটা ছিল তাঁর কল্পনা বহির্ভূত এবং দৃষ্টিকটু। কাজেই সেই ক্ষণে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন যে সমুদয় পরিস্থিতির মোকাবেলা করে যে কোন কিছুর বিনিময়ে খাজা সাহেবের দুর্বীর গতি রুদ্ধ করে দিবে। অতঃপর পৃথ্বীরাজ তার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে প্রেরণ করে খাজা সাহেবকে সদলবলে যথা শীঘ্র আজমীর হতে প্রস্থান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। অবাধ্যতা করলে বাধ্য করা হবে বলেও হুশিয়ারী প্রদান করে।

পৃথ্বীরাজের অবাঞ্ছিত খবর শ্রবণে খাজাসাহেব বিরক্তি বোধ করলেন এবং পবিত্র জবান মোবারক হতে উচ্চারিত হল যে, “আমাকে আজমীর ত্যাগে বাধ্য করার আগে পৃথ্বীরাজকে মুসলমান যোদ্ধাগণের নিকট সমর্পণ করে দিলাম।”

### অলৌকিক আশীর্বাদ পুষ্ট সুলতান শাহাবুদ্দীন

#### ঘোরীর হিন্দুস্থান আক্রমণ

আতায়ে রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর সাথে রাজা পৃথ্বীরাজের যখন সংঘাত চলছিল, সে সময়ে সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘোরী পূর্ব পরাজয়ের গ্লানি মোচনার্থে রাজকীয় ভোগ বিলাস বর্জন পূর্বক পুনর্বীর যুদ্ধযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। অমিত তেজী যোদ্ধা শাহাবুদ্দীন ঘোরী “তারৌড়ীর” ১ম যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়কে কোন রকমে গ্রহণ

করতে পারেনি, তাঁর দুর্বলতার সুযোগে যে সমস্ত যোদ্ধাগণ যুদ্ধ ময়দান ত্যাগ করে পলায়ন করেছিল তাদের গলায় জাও ভর্তি পাত্র বুলায়ে সমস্ত শহর ভ্রমণের নির্দেশ দিয়ে এক ফরমান জারী করে নগর বাসীকে হুশিয়ার করে দেন যে, যদি উক্ত জাও ভর্তি পাত্র হতে কোন ব্যক্তি জাও গ্রহণ না করে তার শিরচ্ছেদ করা হবে।

তিনি যুদ্ধ ময়দান হতে পলায়নের চেয়ে যুদ্ধ রত অবস্থায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই শ্রেয় মনে করতেন। উক্ত অভিমত প্রকাশ করে তিনি পলাতক যোদ্ধাগণকে বহু তিরস্কার করেছিলেন বলে প্রমান পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত রণক্ষেত্র হতে পলাতক বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল, বন্ধু, স্থানীয় শাসক এবং প্রশাসকবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিগত অপরাধ সমূহ মার্জনা করে পুনরায় হিন্দুস্থান আক্রমণের অভিলাস ব্যক্ত করে সুলতান সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন।

উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ শপথ গ্রহণ করে যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দান করে হৃষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ করে সমরায়োজনে আত্মনিয়োগ করেন।

প্রায় বছরাধিক কাল পর্যন্ত অক্লান্ত খাটুনির মাধ্যমে একলক্ষ বিশ হাজার যোদ্ধা এবং সারসরঞ্জাম, রসদপত্র ও অপরাপর আনুসঙ্গিক কার্য সমাধা করে শুভ যুদ্ধযাত্রার প্রাক প্রস্তুতি সমাপ্ত করেন।

উক্ত সন্ধিক্ষেপে নিশীথ রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নযোগে একজন বুজুর্গ ব্যক্তি শুভ বার্তা প্রদান করে বললেন “হে শাহাবুদ্দীন, হিন্দুস্থান বিজয়ের প্রতি মনযোগী হও। খোদা তোমাকে উক্ত রাজ্যের বাদশাহী দান করবেন।”

উক্ত স্বপ্নদৃষ্টে শঙ্কামুক্ত অবস্থায় পরের দিন প্রত্যুষে শাহী দরবারের সমুদয় অমাত্যবর্গের উপস্থিতিতে বিগত রজনীর স্বপ্নের বর্ণনা দান পূর্বক তাদের মতামত যাচাই করেন। সবাই একবাক্যে শুভলক্ষণ মনে করে দ্বিগুণ উৎসাহের সাথে খোদার উপর ভরসা করে পূর্ব উল্লেখিত তারৌড়ীর

রণক্ষেত্রের দিকে মহাসমারোহে অগ্রসর হতে থাকেন।

অপর দিকে দাঙ্গিক রাজা পৃথীরাজ খাজা সাহেবকে দেয়া নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যেই তার ভ্রাতা দিল্লীর প্রশাসক খাওরাও কর্তৃক তলবী বার্তা পেয়ে আজমীর ত্যাগ করে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে। খাজা সাহেবের মুখে সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘোরীর হিন্দুস্থান অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রার খবর শুনে রাজাকে অতিরিক্ত বিচলিত করেছিল। খাজা (রঃ)র মুখে নিঃসৃত বাণী খোদা সাফল্যে রূপদান করেন।

খাওরাও এবং পৃথীরাজ মুষ্টিমেয় জনাকতেক রাজা ব্যতীত হিন্দুস্থানের সমুদয় রাজন্যবর্গকে ধর্ম এবং রাজ্য রক্ষার আবেদন জানিয়ে তাদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে। রাজন্যবর্গ সর্বত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করে শপথ গ্রহণ করে। হিন্দুস্তানের রাজন্যবর্গের সহযোগিতায় পৃথীরাজ ১লক্ষ পদাতিক, তিন হাজার অশ্বারোহী এবং ১৬ হাজার তৈজসপত্রবাহী লক্ষর নিয়ে তারৌড়ী রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়।

সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘোরী লাহোর পৌঁছে রাজা পৃথীরাজের নিকট বশ্যতা স্বীকারের আমন্ত্রণ জানিয়ে একজন দূত প্রেরণ করেন।

পৃথীরাজ জবাবে সুলতানকে হিন্দুস্থানের ত্রিসীমানা হতে প্রস্থান করতে বলে। অন্যথা যুদ্ধ ময়দানে ফয়সালা করার হুশিয়ারী প্রদান করে।

কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক ইংরেজ লেখক সুলতানের মান খাট করার মানসে বর্ণনা করেছেন যে, হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গের দৌদুল্যমানতার কারণে পৃথীরাজ পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করে নাই। কিন্তু নির্ভরযোগ্য তথ্যে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তারৌড়ীর ২য় যুদ্ধে ন্যূনপক্ষে ১৫০ জন রাজা সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা দান করেছিল। ১ম যুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল মাত্র ৬০ কিংবা ৭০ জন রাজা। কনৌজের রাজা জয়চাঁদ পৃথীরাজের পরম শত্রু হওয়া সত্ত্বেও ২য় যুদ্ধে পূর্ণ সহায়তা দান করেছিল। ৫৮৮ হিজরী সনের ২৭ মোহররম মাসে দুই দলের মরণোন্মুখ যোদ্ধাদল পরস্পরের সম্মুখে অবস্থান গ্রহণ করে। সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘোরী দক্ষ সমর বিশারদ হিসেবে যোদ্ধাদলকে পরিচালনা করে সূর্য উদয়ের পরে যুদ্ধ আরম্ভ করে অপরাহ্ন ৪

ঘটিকায় যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

উক্ত যুদ্ধে ন্যূনপক্ষে ২০ জন রাজা নিহত কিংবা আহত হয়। খাঞ্জেরাও নিহত নাকি জীবিত ছিল তার কোনরকম প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

পলায়নরত অবস্থায় পৃথ্বীরাজকে সরস্বতী নদীর তীর হতে বন্দী করে, কারো মতে যুদ্ধ ময়দানে, কারো কারো মতে গজনীতে শিরশ্ছেদ করা হয়।

### আজমীর অভিমুখে সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘোরী

তারৌড়ী রণক্ষেত্রের অভাবনীয় সাফল্যের পরে সুলতান হ্যাঙ্গী দুর্গ, সামানা এবং কোহরাম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গসমূহ দখল করে আজমীরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁর দিল্লী আগমনের গাথে তারৌড়ী রণভূমিতে নিহত রাজন্য বর্গের সন্তানগণের সাদর সম্ভাষণে মুগ্ধ হয়ে তাদের পৌত্রিক রাজ্য প্রত্যর্পণ করে এক মহানুভবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

বহু সংখ্যক লেখকের বর্ণনানুযায়ী আজমীরে খাজা সাহেবের অবস্থানের কথা সুলতান জ্ঞাত ছিলেন না। আজমীর আগমনের পরে সুলতান একদল দরবেশের অবস্থানের কথা জ্ঞাত হয়ে তাঁদের সাথে সাক্ষাতের মানসে দরবেশগণের আস্তানায় উপস্থিত হন। দরবেশগণকে নামাজের জন্য কাতার বন্দ দর্শনের পর তিনিও নামাজ আদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে যান। নামাজ শেষে ইমাম সাহেবের সাথে হস্ত মিলাতে গিয়ে খাজা সাহেবকে দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে পড়েন।

হিন্দুস্থান বিজয়ের শুভ সংবাদ দাতার স্মৃতি তার হৃদয়ে জাগরিত ছিল বিধায় খাজা সাহেবকে চিনতে তার বিলম্ব হল না। আতঃপর তিনি গরীবে নেওয়াজের (রঃ) এর কদমবুচি করে দণ্ডায়মান হলে খাজা সাহেবে তাঁকে আলিঙ্গন পূর্বক পার্শ্বে উপবেশন করান।

খাজা সাহেবের নিকট হতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ যেমন সমসাময়িক হিন্দুস্থানের রাজন্যবর্গের সাথে হৃদ্যতা পূর্ণ সম্পর্ক বজায়

রাখা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি লাভ করে প্রস্থান করেন। প্রবাদ আছে যে, গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর অনুরোধে সুলতান পৃথ্বীরাজের পুত্রকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করে ছিলেন।

### আতায়ের রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর প্রতি আসক্ত মুসলমান বাদশাহগণ

১২০৬ হিজরী সনে সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘোরী শাহাদত বরণ করার পর কুতুবুদ্দীন আইবক সুলতান মনোনীত হন। তিনি খাজা সাহেবের প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতের ব্যাপারে কোন নির্ভর যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সুলতান আইবকের আজমীর প্রশাসক হোসাইন জঙ্গ সুরী গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর মুরীদানগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

১২১০ হিজরী সনে অশ্ব হতে পতিত হয়ে সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবক ইহধাম ত্যাগ করলে সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ (ইলতুমিশ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খাজা সাহেবের ১ম খলিফা হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) এর পরম ভক্ত ও খলিফা ছিলেন।

কিছু সংখ্যক লেখকের বর্ণনায় দেখা যায় যে, গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এবং সুলতান আলতামাশ এর মধ্যে মাত্র ১ বার কিংবা ২বার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে। উক্ত সাক্ষাতকালীন সময়ে তিনি খাজা সাহেবকে নজরানা স্বরূপ কয়েক থলি স্বর্ণ মুদ্রা এবং একটি গ্রাম প্রদান করেছিলেন।

### তাবলিগ এবং এশাআতে ইসলামে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ)

খাজা সাহেব স্বীয় মাতৃভূমি হতে হিজরত করে হিন্দুস্থানের মাটিতে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য জীবনের অর্ধেকেরও অধিক সময় ব্যয়

করেছেন। তাঁর দৃঢ়তায় উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মের ভিত্তি সৃষ্টি হয়। অসংখ্য লোক ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়। খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) কোন্ পন্থা অবলম্বন করে ইসলাম ধর্মপ্রচার করেছিলেন, সেই ব্যাপারে লেখক সমাজ এক প্রকার নীরবতা পালন করে গেছেন। একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, খাজা সাহেব ছিলেন ছজুর (দঃ) এর মূর্ত প্রতীক। তার অমায়িক আচরণ, বদান্যতা, পরোপকারী, কেলামতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অধিক লোক মুসলমান হয়েছিলেন।

প্রবাদ আছে যে, কোন বিধর্মী লোক তাঁর আস্তানায় একবার আগমণ করলেই মুসলমান হয়ে যেতেন।

### তাবলীগের প্রসারতায় মনোনিবেশ

সল্পকালের মধ্যে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর সুখ্যাতি চূতর্দিকে প্রসারিত হয়ে পড়লে দূর দূরান্ত হতে অসংখ্য লোক তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে লাগল। যাতে লোকজনের কষ্ট লাঘব হয় এবং হক ও বাতেল সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হয়, সেহেতু তিনি স্বীয় প্রতিনিধিগণকে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেছিলেন।

### গরীব দরদী খাজা সাহেব

আতায়ের রসুল, গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) বাল্যকাল হতেই পরহিতার্থী ছিলেন। শিশু অবস্থায় আপন নুতন জামা কাপড় অপর শিশুকে দান করে দিতেন। অভাবগ্রস্থগণের অভাব মোচনে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। তার নিকটে আগমণ করে কোন মেহমান আহার করা ব্যতীত প্রস্থান করতে পারত না। তাঁর অনুগামীগণের প্রতি এমনভাবে উপদেশ দান করতেন যেন ফকীর, গরীব এবং এতিম মিছকিনগণকে কখনও অবজ্ঞা না করে। উপরোক্ত কারণ সমূহের জন্য তাঁকে গরীবে নেওয়াজ (রঃ) লকবে আখ্যায়িত করা হয়।

দূর দূরান্ত হতে আগত মেহমানগণ যাতে অন্নাভাবে কষ্ট না পায়

এবং দরবারস্থ লোকজনের সুবিধার জন্য জীবদশায় তিনি লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করে যান। অদ্যাবধি উক্ত লঙ্গরখানা হতে প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে।

### ধন সম্পদের প্রতি খাজা সাহেবের অনাসক্তি

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর জীবদশায় বহু আমির ওমরাহগণ তাঁর ভক্ত ছিলেন। তিনি কশ্মিরকালেও স্বীয় লোভ লালসার বশীভূত হয়ে কারও দারস্থ হননি। উপরন্তু কোন সময় নজরানা স্বরূপ কিছু প্রেরিত হলে তা তিনি তাবলীগের স্বার্থে, অভাবগ্রস্থগণের অভাব মোচনে কিংবা লঙ্গরখানার ব্যয় নির্বাহার্থে অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। তিনি সব সময় চাকচিক্যময় পোষাক ব্যবহার পরিহার করে চলতেন, অনেক সময় গাছের কন্টক দ্বারা জীর্ণ কাপড় সংযুক্ত করতেন।

পড়শীগণের প্রতি তিনি সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন এবং যথা সম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা দান করতেন। মহল্লার কোন লোকের মৃত্যু হলে তিনি নামাজে জানাযায় অংশ গ্রহণ করতেন। লাশ কবরস্থ হবার পরে, সমুদয় ব্যক্তি প্রস্থান করলে তিনি তথায় অবস্থান পূর্বক মৃত ব্যক্তির মাগুফেরাত কামনা করতেন। খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) মুরীদানগণের প্রতি সর্বদা নেক দৃষ্টি রাখতেন।

একদা যৌবনে বাবা ফরিদুদ্দীন গঞ্জশকর (রঃ) আল্লাহর ধ্যানে তন্ময় অবস্থায় খানাপিনার প্রতি অবহেলার দরুণ এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, খাজা সাহেব তাঁর নিকটে গমন করবার পরেও তিনি দণ্ডায়মান হয়ে গরীবে নেওয়াজ (রঃ)কে সম্মান প্রদর্শন করতে সক্ষম হননি।

অনুরূপ অবস্থায় স্বীয় ১ম খলিফা হজরত বখতেয়ার কাকী (রঃ)কে বললেন, “বাবা বখতেয়ার, তোমার এখানে কাউকে দান করার আছে কিনা” তদুত্তরে বখতেয়ার কাকী (রঃ) বললেন, “ফরিদুদ্দীন আছে।”

খাজা (রঃ) বললেন “চল তাঁকে দেখে আসি”। উভয় তাপস বাবা

ফরিদুদ্দীন গঞ্জশকর (রঃ) এর এবাদত গাহে গমন করলেন। কিন্তু বাবা ফরিদ এত ক্ষীণ ও দুর্বল হয়েছিলেন যে, দণ্ডায়মান হয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে সক্ষম ছিলেন না। গরীবে নেওয়াজ (রঃ) খাজা বখ্তেয়ার কাকী (রঃ)কে লক্ষ্য করে বললেন “বাবা বখ্তেয়ার, এই অমিত তেজস্বী বাজ পাখীকে তুমি আর কতদিন জালে আবদ্ধ করে রাখবে। একে কিছু দান পূর্বক আজাদ করে দাও।”

তদুত্তরে খাজা বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) বললেন, “জনাব, আপনি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে আমার কিই বা করণীয় থাকতে পারে।”

অতঃপর খাজা সাহেব বখ্তেয়ার কাকী (রঃ)কে বললেন “চল উভয়ে মিলে তার জন্য দোয়া করি” উভয় বুজুর্গ বাবা ফরিদুদ্দীন গঞ্জশকর (রঃ)কে মধ্যখানে রেখে খোদার দরবারে প্রার্থনা পূর্বক তাঁকে কামেলীয়াতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়ে দেন।

### ক্রোধ ও বিদ্বেষহীন খাজা

খাজা সাহেব আজমীর আগমণের প্রাক্কালে সল্প সময়ের জন্য দিল্লী অবস্থান করেন। উক্ত সময়ে একজন বিধর্মী যুবক আন্তিনের তলায় গোপন ভাবে একখানা চাকু নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর প্রাণ সংহার করা।

দরবারে উপস্থিত হওয়া মাত্র আল্লাহর প্রিয় ওলী দিব্য দৃষ্টিতে যুবকের মনোভাব বুঝতে সক্ষম হয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে যুবক কেন অপেক্ষা করতেছ, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করে প্রস্থান কর। উক্ত বাক্য উচ্চারণের সাথে সাথে যুবকের চাকু ভূতলে খসে পড়ল। যুবক খাজা সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে অত্যন্ত ভীত ও লজ্জিত হয়ে গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর চরণতলে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে খাজা সাহেব তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করে দোয়া করেন। পরে যুবক মুসলমান হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে, খাজা (রঃ) কলেমা পড়িয়ে

তাকে মুসলমান করে নেন।

প্রবাদ আছে যে, খাজা সাহেবের নেক দোয়ার বরকতে উক্ত ব্যক্তি জীবনে ৪৫ বার হজব্রত পালন করে ছিলেন। খাজা সাহেব একদা দিল্লী পৌঁছে অবগত হলেন যে, তথাকার প্রখ্যাত আলেম শায়খুল ইসলাম মৌলানা নিজামুদ্দীন সগরী (রঃ) খাজা বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) এর সাথে বিদ্বেষভাব পোষণ করেন, গরীবে নেওয়াজ (রঃ) তাঁর পরম ভক্ত বাদশাহ আলতামাশ এর নিকট অভিযোগ পেশ করার কথা চিন্তা না করে বখ্তেয়ার কাকী (রঃ)কে বললেন “তুমি আমার সঙ্গে আজমীর গমনের জন্য প্রস্তুত হও”।

দিল্লীর আপামর জনসাধারণ কুতুবুদ্দীন (রঃ) এর প্রতি সীমাহীন আসক্ত ছিল। তিনি কোন স্থানে গমন করলে উক্ত যাত্রা পথের ধুলা, বালি, জনগণ বরকতের জন্য সংগ্রহ করতো। খাজা সাহেবের সহগামী হয়ে বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) যখন আজমীর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন, তখন এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করে দিল্লী নগরীর আবালবৃদ্ধ বণিতা খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) এর শরণাপন্ন হয়ে তাদের বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) এর বিরহের কথা অশ্রুসিক্ত নয়নে সবিস্তারে বর্ণনা করে। সবাই বিনয় সহকারে খাজা সাহেবকে আগলিয়ে ধরে বলল, “হুজুর, আমাদের অন্ধের যষ্ঠি, নয়নের মণি, কলিজার টুকরা বখ্তেয়ার কাকী (রঃ)কে আমাদের নিকট হতে সরিয়ে দিবেন না। আমরা তাঁর নিমিত্তে যে কোন ধরণের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। গরীবে নেওয়াজ (রঃ) দিল্লীবাসীর হৃদ্যতা, আত্মত্যাগের স্বরূপ লক্ষ্য করে অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে তাঁর প্রিয় এবং ১ম খলীফা হজরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (রঃ)কে স্থায়ীভাবে দিল্লীতে বসবাস করবার আদেশ দান করে তিনি আজমীর প্রত্যাবর্তন করেন। মৌলানা সাহেবের বিরুদ্ধে কোনরকম অভিযোগ কিংবা অবজ্ঞা সূচক একটি শব্দও তিনি ব্যক্ত করেননি।

খাজা গরীবে নেওয়াজ ৫৩

## কোমল হৃদয় খাজা (রঃ)

আতায়ে রসুল, গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান চিশ্‌তী সঞ্জরী (রঃ) ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী খোদা ভীতিমূলক কোন প্রকার আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে আসলে কিংবা কবর আজাব এর ব্যাপারে আলোচনা করলে তিনি চক্ষুজলে বুক ভাসিয়ে দিতেন। তিনি ছিলেন সরদারে দোজাহান হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) সুনুতের একনিষ্ঠ অনুসারী। প্রিয় হুজুর (দঃ) প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন।

## ত্যাগ ও বি নাসিতা বিমুখ খাজা সাহেব

আত্ম ত্যাগের অর্থ ইহা নয় যে, বস্ত্র বর্জিত অর্ধ-উলঙ্গ কিংবা উলঙ্গ থাকার। খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) আত্মত্যাগী গণের মধ্যে এক নজীর বিহীন দৃষ্টান্ত। স্বচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক নব্য যুবক যার জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহে কোনরূপ বাধা বিঘ্ন ছিল না, কেবল মাত্র খোদার প্রেমে মত্ত হয়ে স্বর্বিবিধ মোহ-মায়া বিসর্জন দিয়ে হিজরতের মাধ্যমে অবর্ণনীয় কায় ক্লেশ সহ্য করে ঐশী জ্ঞানের সন্ধানে দেশ হতে দেশান্তরে পরিভ্রমণের যে দৃষ্টান্ত তিনি পৃথিবীর মধ্যে স্থাপন করে গেছেন তা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

তিনি কেবল মাত্র মহান প্রভুর উপরে ভরসা করে নানা প্রকার কুসংস্কারে ভরপুর বিধর্মী অধ্যুষিত হিন্দুস্থানে আগমন করেছিলেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাঙ্গেস্ দেহলভী (রঃ) “আনফাসুল আরেফীন” নামক কেতাবে বর্ণনা করেছেন যে, যদি গরীবে নেওয়াজ (রঃ) পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করতেন, তাহলে তাঁর বহু সংখ্যক ভক্ত রাজা মাহারাজাবন্দ কেবল ইঙ্গিতে ধন সম্পদের পাহাড় প্রস্তুত করে দিতেন।

তিনি আজমীর আগমণের প্রথম দিবসে যে এক টুকরা চটের আসন

খাজা গরীবে নেওয়াজ ৫৪

সংগ্রহ করেছিলেন, তা জীবন সায়াহেও পরিত্যাগ করেননি। তিনি বহু অভাব অনটনের মধ্যেও কালাতিপাত করে ছিলেন। কিন্তু কস্মিনকালেও রাজা বাদশাহগণ কর্তৃক দেয়া ভাতা কিংবা জায়গীরদারী গ্রহণ করেন নি।

## ছামা বা কাওয়ালীর অনুরক্ত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ)

ইসলামী জগতে “ছামা” বা কাওয়ালী অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম সমাজের বহু বিজ্ঞ মহাত্মাগণ “ছামা”কে একবাক্যে অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

অপর দিকে তরিকতপন্থী ব্যক্তিবর্গ “ছামা”কে কেবলমাত্র বৈধই মনে করেন নি, উপরন্তু কিছু কিছু বাধ্য-বাধকতার মাধ্যমে একে ধর্ম প্রচারের একটা উত্তম পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করেন।

## খাজেগানে চিশ্‌ত এর দৃষ্টিতে “ছামা” এক বিশেষ স্থানের অধিকারী

চিশ্‌তীয়া পন্থী বুজর্গগণ “ছামা” অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যে রূপরেখা দিয়েছেন তা পালন করে “ছামা” অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

বর্তমান কালে গুরুত্ব সহকারে “ছামা” বা কাওয়ালী অনুষ্ঠান হচ্ছে। অন্যদিকে অনেকেই একে অর্থ উপার্জন এবং মনোরঞ্জনের মাধ্যম হিসেবেও গ্রহণ করেছে।

খাজেগানে চিশ্‌ত এর দৃষ্টিতে যেরূপভাবে “ছামা” অনুষ্ঠান ছিল, এর সাথে বর্তমানে বহুল প্রচলিত “ছামা” অনুষ্ঠানের প্রচুর তারতম্য রয়েছে।

চিশ্‌তীয়া তরিকত পন্থী অলি আল্লাহগণ তদীয় মুরীদানগণের জন্য “ছামা” বা কাওয়ালী অপরিহার্য উল্লখ করেছেন বলেও কোন সঠিক প্রমাণ উপস্থাপন করা দুরূহ। অধিকন্তু তাঁরা “ছামা” অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যে

সমস্ত কঠিন বিধি নিষেধ আরোপ করে গিয়েছেন পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম।

### “ছামা” অনুষ্ঠানের ব্যাপারে খাজা নিজামুদ্দীন আওলীয়ার প্রথম খলিফা শেখ নাসিরউদ্দীন মাহমুদ চেরাগ দেহলভী এর মতামত

মাহাবুবে এলাহী হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলীয়া (রঃ) “ছামা” বা কাওয়ালী এর ভীষণ অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু তদীয় ১ম খলিফা হজরত শেখ নাসিরউদ্দীন মাহমুদ চেরাগ দেহলভী এর বিপরীত মনোভাব পোষণ করতেন।

একদা তাঁর একজন পীর ভাই “ছামা” বা কাওয়ালী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। বাদ্য-বাজনার সাথে কাওয়ালী আরম্ভ হবার পরে, তিনি মজলিসে “ছামা” হতে গাত্রোথান করতে উদ্যত হলে, উপস্থিত লোকজন চিশ্‌তীয়া পন্থীগণের বিরুদ্ধাচারনকারী হিসেবে অভিহিত করে “ছামা” এর প্রতি তাঁর অনাসক্তির হেতু জ্ঞাত হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে তদুত্তরে তিনি বলেন, চিশ্‌তীয়া পন্থী বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গ “ছামা” অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন কিংবা স্বয়ং অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন, এটা কোন অকাট্য যুক্তি নয়। কোরান ও হাদীস হতে প্রমাণ পেশ কর।

মাহাবুবে এলাহী খাজা নিজামুদ্দীন আওলীয়ার নিকট পরে অভিযোগ পেশ করা হলে তিনি স্মিত-হেসে বলেন “শেখ নাসিরউদ্দীন চেরাগে দেহলভী-এর মতবা অনেক উর্ধে।”

### “ছামা” এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন

চিশ্‌তীয়া পন্থী বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গ যারা “ছামা” কে বৈধ মনে করতেন, তাঁরা চলিত নিয়মে “ছামা” অনুষ্ঠানের পক্ষপাতি ছিলেন না। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলীয়া (রঃ) ছামার জন্য নিম্নলিখিত শর্তারোপ

করেনঃ

- (ক) “ছামা” অনুষ্ঠানে যে কোন ধরণের রমনীর উপস্থিতি নিষিদ্ধ।
- (ক) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালাক “ছামা” অনুষ্ঠানে থাকতে পারবে না।
- (গ) বাদ্য বাজনা সহকারে “ছামা” অনুষ্ঠিত হতে পারবে না।
- (ঘ) যা কিছু শ্রবণ করা হবে, কেবলমাত্র আল্লাহতাআলার ওয়াস্তে শ্রবণ করতে হবে। “ছামা” চলাকালীন সময়ে কোন প্রকার অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ করতে পারবে না।

চিশ্‌তীয়া তরিকার সুপ্রসিদ্ধ ওলীয়ে কামেল হজরত শেখ কলিমুল্লা জাহানাবাদী (রঃ) তার উত্তরসূরী পীর ও বুজুর্গগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে রচিত “আশরাতুল কামেলাহ” কেতাবে “ছামা” অনুষ্ঠানের যে, সমস্ত নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন সর্বসাধারণের অবগতির জন্য তা নিম্নে উদ্ধৃত করলামঃ

(১) “ছামা” অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে শুরু হতে শেষ অবধি বা ওজু থাকতে হবে।

(২) কোনরকম দৃষ্টি আকর্ষণীয় বস্তুর উপস্থিতিতে সর্বসাধারণে বা উন্মুক্ত স্থানে “ছামা” অনুষ্ঠান করা যাবে না।

(৩) নামাযের সময় কিংবা আহারের সময় অথবা অন্য কোনরূপ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি “ছামা” অনুষ্ঠিত হতে পারবে না।

(৪) “ছামা” অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণকারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

(৫) “ছামা” অনুষ্ঠিত হবার প্রারম্ভে ১বার সুরা ফাতেহা শরীফ, ৩বার সুরা এখলাস্ এবং হুজুর (দঃ) এর প্রতি দরুদ পাঠ অব্যাহত থাকতে হবে।

(৬) “ছামা” অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলভাবে আসন গ্রহণ করা অবৈধ, দোজানু হয়ে বসতে হবে।

### খাজা গরীবে নেওয়াজ ৫৭

(৭) কাওয়াল যাতে ওজুব্বিহীন না থাকে এবং অবাস্তিত ব্যক্তি না হয়। তাকে উপটোকন হিসেবে যা প্রদান করা হবে তা অনুগ্রহ বলে গণ্য করতে হবে।

(৮) “ছামা” শ্রবণে অনাসক্তি জন্মিলে তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠান হতে প্রস্থান করতে হবে। কেবলমাত্র রাগ ও বাদ্য বাজানা শ্রবণের মনোবৃত্তি নিয়ে অংশ গ্রহণ করে থাকলে হারামে গণ্য হবে।

(৯) “ছামা” অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে অবনত মস্তকে আল্লার ধ্যানে মশ্গুল থাকতে হবে।

(১০) “ছামা” অনুষ্ঠান শেষে ১বার সুরা ফাতেহা শরীফ, ৩বার সুরা এখলাস ও হুজুর (দঃ) প্রতি দরুদ পাঠ করে মাহফিলের সমাপ্তি ঘোষণা করতে হবে।

উপরোক্ত বিধান সমূহ অবমাননা করে “ছামা” অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে কিংবা শ্রবণ করলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা অত্যধিক।

### “ছামা” এর প্রতি আসক্ত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ)

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) “ছামা” এর প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন। তিনি “ছামা” অনুষ্ঠান দ্বারা তাবলিগের কার্য সমাধা করেছিলেন। তৎকালীন হিন্দুস্থানে কবিতা ও গানের আসরের বহুল প্রচলন ছিল। অতি সহজ পন্থায় লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি “ছামা” অনুষ্ঠানকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

অনুমান সাপেক্ষে বলা যায় যে, তিনি দুই ধরনের “ছামা” অনুষ্ঠান করতেন।

স্বীয় মতাবলম্বীগণের জন্য এক ধরনের অনুষ্ঠান, সর্বসাধারণের জন্য অন্য ধরনের ব্যবস্থা ছিল। কারণ স্বীয় ভক্তবৃন্দের অনুষ্ঠানে সর্বসাধারণের যোগদান এক প্রকার নিষিদ্ধ ছিল।

### খাজা গরীবে নেওয়াজ ৫৮

“দলীলুল আরেফীন” কেতাবের বর্ণনানুযায়ী “ছামা” চলাকালীন সময়ে তিনি আত্মভোলা হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন।

একদা খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এবং অন্যান্য কয়েকজন দরবেশগণের উপস্থিতিতে খাজা আবু ইউসুফ চিশ্তী (রঃ) এর খানকায় “ছামা” অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কাওয়াল আল্লাহতাআলা এবং হুজুর (দঃ) এর শানে একখানা ফার্সী ভাষায় রচিত কাওয়ালী পাঠ করতে আরম্ভ করলে খাজা সাহেব আত্মভোলা হয়ে পড়েন এবং ক্রমাগত ভাবে ৭ দিন ৭ রাত উক্ত অবস্থায় কালক্ষেপণ করেন। কিন্তু সব সময় তাঁর কলব্ আল্লাহর জিকিরে মশ্গুল ছিল।

হজরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) এর বর্ণনানুযায়ী, খাজা সাহেব কর্তৃক অনুষ্ঠিত “ছামা”র মজলিসে প্রখ্যাত দরবেশগণ, বিজ্ঞ আলেম ও মশায়খবৃন্দ উপস্থিত থাকতেন।

### দলীলুল আরেফীনের সংক্ষিপ্তসার

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) এর প্রথম খলিফা হজরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) স্বীয় পীর মোর্শেদের অমূল্য মুখ নিঃসৃত বাণী সমূহকে মূল ফার্সী ভাষায় কেতাব আকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মূল ফার্সী ভাষার মাধুর্যতা হয়তো বাংলা ভাষায় পাওয়া সম্ভব নয়, তথাপিও হযরত বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) এর উপস্থিতিতে, খাজা সাহেব যে সমস্ত মজলিস সমূহে বক্তৃতা করেছেন সে সমস্ত বক্তব্যের খায়ের ও বরকতে হয়তো কোন না কোন আল্লাহর বান্দা উপকৃত হতে পারেন, এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে উক্ত বক্তৃতামালা সমূহের সংক্ষিপ্তসার পাঠক মহোদয়গণের সম্মুখে উপস্থাপনে ব্রতী হয়েছি।

## ১ম মজলিশ

হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত মজলিস বাগদাদে অবস্থিত ইমাম আবুল লাইস সমরখন্দী (রঃ) এর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মজলিসে শেখ শাহাবুদ্দীন মোহাম্মদ সোহরোওয়াদী (রঃ), শেখ বোরহানুদ্দীন চিশতী (রঃ) এবং শেখ দাউদ কিরমানী (রঃ) এর ন্যায় যুগ খ্যাত মহাত্মাগণের উপস্থিতিতে “আমি খাজা সাহেবের হস্তে বয়েৎ গ্রহণ করি। তখন আমাকে চারি তরিকতের স্মারক প্রদান করে তিনি নামায সম্বন্ধীয় আলোচনার সূত্রপাত করেন।

গরীবে নেওয়াজ (রঃ) ফরমালেন, নামাযের সমুদয় আরাবীকী পালনের মাধ্যমে নামায আদায়কারীগণ ব্যতিত, আল্লাহর নিকট অপর কোন ব্যক্তি সমাদৃত হবে না। কেননা নামায মোমেনগণের মেরাজ স্বরূপ। হুজুর (দঃ) ফরমায়েছেন” নামায মোমেনগণের মেরাজ; নামায আল্লাহর নৈকট্যলাভে সাহায্য করে এবং অন্তরকে উজ্জ্বল করে।

নামায আল্লাহর সাথে সংযোগকারী সেতুস্বরূপ। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, নামাজ আদায়কারী পরোক্ষ ভাবে আল্লাহর সাথে বাক্যালাপ করে থাকে।

তিনি আরও বলেন যে, “আমি যখন হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ) এর হস্তে বয়েৎ গ্রহণ করি, তখন হতে ক্রমাগত ভাবে দিবা রাত্র ভেদাভেদ না রেখে ৮ বৎসরকাল অবধি তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকি। তাঁর সফরকালীন সময়ে প্রায়শঃ আমি সাথে থাকতাম। তাঁর সমুদয় তৈজসপত্র স্বীয় মস্তকে বহন করতাম, প্রত্যেকটি আদেশ ও নির্দেশ অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্তে পালন করতাম। আমার খেদমতে তিনি যারপরনাই সন্তুষ্ট ছিলেন। যার ফলে তিনি এমন সম্পদ দান করেছেন, যা আমার পক্ষে ব্যক্ত করা অসম্ভব।

মুরীদানগণের উচিৎ অবনত মস্তকে পীরের আদেশ এবং নির্দেশ

পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বাস্তবায়িত করা, পীরের নির্দেশিত আমল ও ওজীফা ইত্যাদি কায়মনোবাক্যে পালন করলেই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

পীরগণ কর্তৃক নির্দেশিত শিক্ষায় সর্বাবস্থায় মুরীদানগণের মঙ্গল নিহিত। আমার সুহদ শাহাবুদ্দীন সোহরোওয়াদী (রঃ) দিবা রাত্র পার্থক্য না করে একাদিক্রমে পীরের হজ্জের সফরে সহযাত্রী অবস্থায় সেবার দরণ, ওলীয়ে কামেল হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

## হুজুর (দঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ

হযরত খাজা আবুললাইস (রঃ) কর্তৃক প্রণীত “তস্বিয়াহ” নামক কেতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, প্রত্যহঃ দুজন ফেরেস্তা, তন্মধ্যে একজন কাবা শরীফের ছাদের উপর দণ্ডায়মান হয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে থাকে যে, “হে স্রষ্টার সৃষ্টি সকল, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর নির্দেশিত হুকুম বাস্তবায়নে অবহেলা করতেন, তারা আল্লাহর নৈকট্যলাভ এবং ক্ষমার অযোগ্য। দ্বিতীয় ফেরেস্তা মসজিদের নব্বীর ছাদে দণ্ডায়মান হয়ে উচ্চ স্বরে বলে, “হে লোক সকল, তোমরা অবগত হও, যে ব্যক্তি নবী করিম (দঃ) এর ছন্নত পালনে অবহেলা করে, তার নিমিত্তে হুজুর পাক (দঃ) সুপারিশ করবেন না।

## ওজু করবার সময় আঙ্গুল খেলাল করা ছন্নত

অতঃপর গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন “একদা পীরানে পীর দস্তগীর (রঃ) এবং আমি মসজিদ “ফকড়ী”তে আলোচনা কালে তিনি একখানা হাদীস শরীফ বর্ণনা করে বলেন, হুজুর (দঃ) সাহাবীগণকে ফরমায়েছেন যে, অজু করবার সময়ে আঙ্গুল খেলালকারীর আঙ্গুল আল্লাহর কৃপা হতে বঞ্চিত হবে না।”

অতঃপর তিনি বলেন, একদা আমি এবং খাজা আজল সিরাজী (রঃ) এক বাগানে মাগরিবের নামাজের সময় ওজু করতেছিলাম, সিরাজী (রঃ) অসাধনতা বশতঃ আঙ্গুল খেলাল করেন নাই এমতাবস্থায় গায়েব হতে

আওয়াজ হল “হে আজল! আমার হাবীব মুহাম্মদ (দঃ) এর বন্ধুত্বের দাবী কর; কিন্তু তাঁর ছন্নত পালনে অবহেলা কেন?”

উক্ত আওয়াজ শ্রবণের পরে তিনি খুবই অনুতপ্ত হন এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, জীবনে আর কোন সময়ে অনুরূপ ভুল করবেন না। তিনি জীবিত অবস্থায় প্রায় সময়ে আক্ষেপ করে বলতেন “কোন সাহসে বা কিভাবে আমি হুজুর (দঃ) এর সাক্ষাৎ প্রার্থী হবো।”

### ওজুকালীন সময়ে নির্দেশিত স্থান সমূহ ৩ বার ধৌত করা হুজুর (দঃ) এর ছন্নত

অতঃপর খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন, হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত “সালাতুল মাসুদী” নামক কেতাবে উল্লেখ আছে যে, হুজুর পাক (দঃ) ফরমায়েছেন “ওজুর সময়ে নির্দেশিত স্থান সমূহ ৩ বার ধৌত করা আমার এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ছন্নত। ৩ বারের অতিরিক্ত ধৌত করা দোষণীয়।

এ প্রসঙ্গে তিনি একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, একদিন খাজা ফজিল বিন আয়াজ (রঃ) অসাবধানতা বশতঃ ৩ বারের চেয়ে কম ধৌত অবস্থায় ওজু সম্পন্ন করে নামায আদায় করেন। নিদ্রিত অবস্থায় হুজুর (দঃ) তাঁকে বললেন “ফজিল, খুবই পরিতাপের বিষয় যে, তুমি আমার অপছন্দনীয় ওজু এর সাথে নামায আদায় করেছ।”

এ ঘটনার পর হতে অত্যন্ত লজ্জিতভাবে তিনি দৈনিক ৫শত রাকাত নামায ১ বৎসর কাল অবধি কাফ্ফারা হিসেবে আদায় করেন।

### শয়ন কালে ওজু অবস্থায় শোয়ার ফজিলত

খাজা গরীবে নেওয়াজ বলেন, ওজুরত অবস্থায় শয়নকারীগণের জন্য আল্লাহতায়াল্লা ফেরেস্তাগণকে পাহারা দিবার নির্দেশ দিয়ে থাকে। ওজুরত অবস্থায় শয়নকারীর শিয়রে জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত ফেরেস্তাগণ দণ্ডায়মান

অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে খোদার দরবারে প্রার্থনা করতে থাকে। যে ব্যক্তি ওজুরত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে, ফেরেস্তাগণ উক্ত ব্যক্তির রুহ্ আল্লাহর আরশের নিচে ভ্রমণ করায় এবং করুণা বর্ষণ করায় জাগ্রত হবার পূর্বে যথাস্থানে সংস্থাপন করে রাখে।

যে ব্যক্তি ওজু বিহীন শয়ন করে, তার রুহ্ আসমানের প্রথম স্তর পর্যন্ত ভ্রমণ করায় যথাস্থানে রেখে যায়।

### ডান হাত/পা এবং বাম হাত-পায়ের ব্যবহার

খাজা সাহেব বলেন, ডান হস্ত খাদ্য গ্রহণ এবং ওজু ইত্যাদির জন্য এবং বাম হস্ত শৌচকাজ বা পরিচ্ছন্নতার জন্য।

মসজিদে প্রবেশের প্রাক্কালে সর্বাঙ্গে ডান পা এবং প্রস্থানের সময় বাম পা অঙ্গে রেখে প্রস্থান করা সুন্নত।

একদা হজরত সুফিয়ান (রঃ) মসজিদে প্রবেশের সময় বাম পা অঙ্গে রেখে প্রবেশের প্রাক্কালে গায়েব হতে আওয়াজ হল “হে সুর” অর্থাৎ (গরু বা বলদ) খানায় কাবায় অনুরূপ ভাবে প্রবেশ করে নাকি? উক্ত ঘটনার পরবর্তীকাল হতে তিনি সুফিয়ান সুরী নামে পরিচিত হতে থাকেন।

### আরেফীনে হক

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন, আরেফ বা পৃণ্যবান ব্যক্তিবর্গের উপর প্রত্যহ নূরে এলাহী বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সর্বদা আল্লাহর উপাসনা তাঁদের কাম্য। তাঁরা অলসতাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকেন। তাঁরা ফজরের নামায সমাপনান্তে সূর্য উদয়ন না হওয়া পর্যন্ত জায়নামাজে বসে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। উক্ত সময়ে একজন ফেরেস্তা পার্শ্বে দণ্ডায়মান থেকে তার অনুকূলে খোদার দরবারে দোয়া করতে থাকে।

## আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তিবর্গের ৪টি আমল

খাজা সাহেব বলেন, হযরত জুনাইদ বোগ্দাদী (রঃ) হতে বণিত যে, একদা হুজুর পাক (সঃ) ইবলিসকে অত্যন্ত বিমর্ষ অবস্থায় লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন “তোমার এরূপ বিষন্নতার হেতু কি? তদুত্তরে ইবলিস বলল “আমি চারটি কারণে খুবই পেরেশানী হালতে আছি।”

**প্রথমতঃ** আপনার উন্নতগণ যখন আজান শ্রবণ করে, সাথে সাথে জবাব দেয়, তখন আল্লাহতায়ালা সেই মুহূর্তে তার সমুদয় পাপ মোচন করে দেন।

**দ্বিতীয়তঃ** যখন কোন ব্যক্তি “নারায়ে তাক্ববীর, আল্লাহ্ আক্ব বর” ধ্বনি সহকারে ইসলামী যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ্ তাআলা শুধু তাকে নয় তার অশ্বের সমস্ত পাপও মার্জনা করে দেন।

**তৃতীয়তঃ** যে ব্যক্তি হালাল রঞ্জীর সন্ধানে ব্যস্ত থাকে, তার পূর্বকৃত পাপ সমূহ মোচন করে দেন।

**চতুর্থতঃ** যে ব্যক্তি ফজর নামায আদায় করে উক্ত জায়গায় আসন গ্রহণরত অবস্থায় সূর্য উদয় না হওয়া অবধি আল্লাহর উপাসনায় লিপ্ত থাকে, সূর্য উদয়নের পরে “এশরাকের” নামায আদায় করে উক্ত স্থান ত্যাগ করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার এবং তার আত্মীয় স্বজনগণের পাপ সমূহ মোচন করে দেন।

## আল্লাহর নৈকট্যবান ব্যক্তিবর্গের স্তর

খাজা গরীবে নেওয়াজ বলেন, আরেফ (আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী) ব্যক্তিবর্গ এক পলকে “হেজাবে আজমত” এবং “হেজাবে কিবরীয়া” অর্থাৎ আকাশ হতে পাতাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে আসে।

“মরদে কামেল” “আরেফ”গণ হতে উচ্চস্তরের ব্যক্তিবর্গের গন্তব্যস্থলের পরিধি স্বয়ং প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কেউ অবগত নয়।

তৎপর খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন, আমার পীরসাহেব কেবল হতে শ্রবণ করেছি, রোজ হাসরে যে ব্যক্তি নামাযের হিসেব দান করতে পারবে। তার জন্য বেহেশত অবধারিত এবং যে দুর্ভাগা নামাযের হিসেব দান করতে অক্ষম হবে তার জন্য দোজখ নির্দিষ্ট।

উপরোক্ত বর্ণনা দান করে তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন, নামায দ্বীনের স্তম্ভ, নামাযের অন্তর্ভুক্ত ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত আরা কীন সমূহও নামাযের স্তম্ভ।

স্তম্ভ দণ্ডায়মান থাকলে গৃহের পতন রোধ করে, স্তম্ভ নড়বড়ে হলে গৃহের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে পড়ে। রুকু সেজদা ইত্যাদি আরা কীন সঠিকভাবে পালন করা না হলে নামাযের অঙ্গহানী করা হল। আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্বতের নিকট নামাযের ন্যায উচ্চ মর্তবার অপর কোন বস্তু নাই।

উক্ত বিষয়ে ইমাম জাহেদ (রঃ) কর্তৃক প্রণীত “সালাতুল মসৌদী” নামক কেতাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা বিদ্যমান।

তিনি বলেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে ৫০টি প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হতে হবে। যদিও বা কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হয়, কিন্তু হুজুর (দঃ) এর সুন্নত পালনের বেলায় অবহেলাকারীকে হুজুর (দঃ) সম্মুখে হাজির করে বলা হবে “এই ব্যক্তি আপনার সুন্নত পালনে অবহেলিত ছিল।”

উক্ত উক্তি পরে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) আক্ষেপের সাথে বলেন, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিবসে হুজুর (দঃ) সম্মুখে লজ্জিত হবে; তার গন্তব্য স্থল কোথায়, তা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেউ জ্ঞাত নয়।

## ২য় মজলিস

এ মজলিসে খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) ব্যতীত হজরত শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরোওয়াদী (রঃ) এবং মৌলানা বাহাউদ্দীন বোখারী (রঃ) ও উপস্থিত ছিলেন।

খাজা গরীবে নেওয়াজ ৬৫

## নামাযের শর্ত সমূহ পালন করা

নামায প্রসঙ্গ উত্থাপন করে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) বলেন, নামায আল্লাহর আমানত স্বরূপ। প্রত্যেকের উচিত আল্লাহর উক্ত আমানত রক্ষা করা। “সালাতুল মসৌদী” নামক কেতাবে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি সঠিকভাবে নামায আদায় করে, উক্ত নামায একজন ফেরেশতা উর্ধ্ব আকাশে নিয়ে যায়। উক্ত নামায হতে এক প্রকার নূরের সৃষ্টি হয়ে শতাধিক দরওয়াজার উৎপত্তি হয়। তৎপর উক্ত নামাযকে আল্লাহতাআলার আরশের নিচে নিয়ে যায়। উক্ত নামায আরশের নিচে সেজদা রত অবস্থায় আদায়কারীর অনুকূলে মগফেরাত কামনা করতে থাকে। যারা নামাযের শর্ত সমূহ সঠিকভাবে পালন করে না, উহা আদায়কারীর চেহারার উপর নিষ্ক্ষেপ করে বলা হয় “অনর্থক কালক্ষেপন করেছ মাত্র”।

গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন, আমি একটি হাদীস শরীফ শ্রবণ করেছি যে, একদা হুজুর (দঃ) এলোমেলোভাবে নামায আদায়কারীকে লক্ষ্য করে নামায আদায় করার পরে উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, “কতদিন হতে অনুরূপ ভাবে নামায পরতেছ?।”

লোকটি বললো “জনাব, ৪০ বৎসর অবধি ঐরূপে নামায আদায় করতেছি।”

হুজুর (দঃ) তখন আক্ষেপ করে বললেন, “তুমি আমার সুনুত হতে বঞ্চিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

## ৩য় মজলিস

খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) বলেছেন যে, মজলিসে তিনি ব্যতীত সমরখন্দের ১৪ জন খ্যাতি সম্পন্ন কামেল ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তদুপরি উক্ত মজলিশে মৌলানা বাহাউদ্দীন বোখারী (রঃ) ও খাজা ওয়াহেদউদ্দীন কিরমানী (রঃ) হাজির ছিলেন।

আলোচনার প্রারম্ভে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) এর নিকট হতে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে নামায কাজ করলে

খাজা গরীবে নেওয়াজ ৬৬

এবং অন্য সময়ে কাজা আদায় করে দিলে, উক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

তদন্তরে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সঠিক সময়ে নামায আদায় করে না, সে কোন্ ধরণের মুসলমান?

তারপর তিনি বলেন, “আমার ওস্তাদ মৌলানা হেসাম মুহাম্মদ বোখারী (রঃ) এর নিকট হতে আমি একখানা হাদীস শ্রবণ করেছি যে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে দুই ওয়াজের নামায একসাথে আদায় করে, তাহলে সে ব্যক্তি বড় ধরণের কাবীরা গুণাহ সমূহের মধ্যে একটি গুণাহে লিপ্ত হল।”

উপরন্তু হযরত আবু হোরাইরা হতে অপর একটি হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, (হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ) নিকট হতে শ্রুত) হুজুর পাক (দঃ) একদা সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে ফরমায়েছেন যে, “আমি মোনাফেকগণের নামায সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞাত করব কি?”

সাহাবীগণ আরজ করলেন, আপনার তরে আমাদের পিতামাতার জান কোরবান, নিশ্চয়ই আমরা তা শ্রবণ করতে উৎকর্ষিত।

হুজুর (দঃ) ফরমালেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আছরের নামায সূর্য অস্ত যাবার সময় আদায় করে সেই ব্যক্তি গুণাহগারের মধ্যে গণ্য হল।

সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রসূল্লাহ (দঃ) সময়ানুবর্তিতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাত করুন। হুজুর (দঃ) ফরমালেন, আসরের নামাযের সময় সূর্যের উজ্জ্বল আলো অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত নির্দিষ্ট। উক্ত আলো হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শীত এবং গ্রীষ্ম কালে কোন তারতম্য নাই।

অতঃপর গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন “আমি হেদায়া” নামক কেতাবে পাঠ করেছি যে, ফজরের নামায সূর্যের আলোতে পড়া শক্ত গুণাহ। শীতকালে জোহরের নামায সূর্য পশ্চিম দিকে হলে পড়ার পরে যখন দম্কা হাওয়া বইতে থাকে তখন পড়া সুনুত।

## খাজা গরীবে নেওয়াজ ৬৭

হজুর (দঃ) ফরমায়েছেন যে, গ্রীষ্মকালে জোহরের নামায ঠাণ্ডা পড়লে আদায় করবে। কারণ উষ্ণতা দোজখের নিদর্শন।

অতঃপর খাজা (রঃ) বলেন আমি “তফসীরে মাহবুব কোরেশী”তে পেয়েছি যে, সঠিক সময় ৫ ওয়াজ নামায আদায়কারীর নামায কেয়ামতের দিবসে উক্ত ব্যক্তির পাথেয় হবে।

হজুর (দঃ) ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে পাঁচ ওয়াজ নামায আদায় করে না, সে বেঈমান! আমি হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ) এর পাক জবানে শুনেছি যে, “ওয়াইল দোজখ” নামায অবহেলাকারীগণের জন্য নিদিষ্ট। “ওয়াইল” দোজখের প্রত্যেকটি কুপ এবং জঙ্গল ভয়াবহ কষ্টের স্থান। মাগরিবের নামায সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে আদায় না করলে গুণাহ হবে।

একদা হযরত ওমর ফারুক (রঃ) মাগরিবের নামায সামান্য দেরীতে আদায়ের কারণে অত্যন্ত মর্মান্বিত হয়ে কাফফারা স্বরূপ একজন ক্রীতদাসকে আযাদ করে দিয়েছিলেন।

## সদকা দানের উপকারিতা

সদকা দান প্রসঙ্গে আলোকপাত করে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্তকে অনু দান করে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত উক্ত সদকা দাতা এবং দোজখের মধ্যস্থলে সাত স্তরের পর্দার সৃষ্টি করে দেন। উক্ত পর্দার ব্যবধান হবে পাঁচ শত বৎসর রাস্তার দূরত্বের সমান।

## শপথের অপকারিতা

তিনি শপথ সম্বন্ধে আলোকপাত করে, বলেন শপথ সত্য হোক কিংবা মিথ্যা হোক, না করাই উত্তম।

যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে তার সংসার হতে বরকত বিদায় গ্রহণ করে।

## খাজা গরীবে নেওয়াজ ৬৮

একদা আল্লাহতায়াল্লা হযরত মুছা (আঃ)কে খেতাব করে বলেন, বে-নামাযী এবং মিথ্যাশপথকারীর জন্য সাতখানা দোজখ সৃষ্টি করা হয়েছে। উক্ত দোজখ সমূহ ভয়ঙ্কর সর্প এবং বিছুর দ্বারা পরিপূর্ণ।

উক্ত দোজখের গলিত পাথরের একবিন্দু পরিমাণ যদি পৃথিবীতে পতিত হয় তাহলে পাহাড় সমূহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে।

## ৪র্থ মজলিস

আলোচনা সভায় খাজা কুতুবুদ্দীন বখতেয়ার কাকী (রঃ) ব্যতিত শেখ শাহাবুদ্দীন সোহারোওয়াদী (রঃ), শেখ সাইফুদ্দীন বোখারী (রঃ), খাজা আজল সিরাজী (রঃ) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

## নিষ্কলুষ প্রেম

খাজা (রঃ) সাহেব বলেন, প্রকৃত প্রেমিক হিসেবে তাকেই গন্য করা বিধেয়, যে ব্যক্তি প্রেমাপ্পদের কারণে দুঃখ দুর্দশার দরণ “আহ” শব্দটুকু পর্যন্ত উচ্চারণ করে না। প্রেমিকের নিকট হতে পর্বত ধ্বংস মস্তকের উপর কিংবা অসংখ্য অস্ত্র মস্তকের উপর আঘাত হানতে উদ্যত হলেও সেই দিকে দ্রুক্ষেপ না করে বরং সমস্ত গ্লানিকে হাসি মুখে বরণ করে নেয়।

তিনি বলেন, আমি “আসরারুল আওলীয়া” কেতাব পাঠে অবগত হয়েছি যে, একদা হযরত খাজা হাসান বসরী (রঃ) হযরত রাবেয়া (রঃ), হযরত খাজা শফিক বলখী (রঃ) ও হযরত মালেক দীনার (রঃ) একস্থানে একসঙ্গে বসে খাঁটি প্রেমিকের বিশ্লেষণে রত হন।

হযরত খাজা হাসান বসরী (রঃ) বলেন, প্রকৃত খোদা প্রেমিকের উপর যত কঠিন বিপদ এবং দুঃখ, ক্লেশ আসুক না কেন, তা হাসি মুখে বরণ করে নেয়।

হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ) বলেন, খাজা সাহেব! এর মধ্যে

স্বীয় অস্তিত্বের গন্ধ আসতেছে।

মালেক দিনার (রঃ) বলেন প্রকৃত খোদা প্রেমিক সমস্ত বিপদাপদকে বরণ করে খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টায় রত থাকে।

হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ) বলেন, প্রকৃত খোদা প্রেমিকের আরও অধিক অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

হযরত শফীক বলখী (রঃ) বলেন, প্রকৃত খোদা প্রেমিককে কেটে খণ্ড-বিখণ্ড করলেও বিরক্তি প্রকাশ করবে না।

হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ) বলেন, আমার দৃষ্টিতে প্রকৃত খোদা প্রেমিকের দাবীদার সেই, যে ব্যক্তি প্রভুর নিকট হতে আগত অবর্ণনীয় বিপদাপদের মধ্যেও বিচলিত না হয়ে তার উপাসনা হতে বিরত না থাকে।

গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন, আমিও হজরত রাবেয়া বসরীর মত পোষণকারী।

### অটুহাস্য করা গুণাহ

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) বলেন, উচ্চস্বরে হাসা গুণাহ! ওলী আল্লাহগণ মুচকি হাসীকেও অপছন্দ করতেন।

হাদিস শরীফে আছে, কবর স্থানে হাসি ঠাট্টা করা শক্ত গুণাহ। কবর স্থানের নিকট দিয়ে গমনকালে কবরবাসীগণ বলতে থাকে, কবরের অবস্থা সম্বন্ধে যদি প্রত্যক্ষ ভাবে জ্ঞাত হবার সুযোগ পেতে তাহলে আতঙ্কে তোমার মস্তক শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত, শরীর হতে গোশ্ ত মোমের ন্যায় গলে যেত।

তিনি এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা দান করেন সেখান থেকে। কেবলমাত্র একটি ঘটনা পাঠকবর্গের খেদমতে পেশ করলাম।

খাজা (রঃ) বলেন, একদা তিনি এবং শেখ ওয়াহেদ উদ্দীন কিরমানী (রঃ)

কিরমান শহরে গমন করেন। তথায় অবস্থানরত একজন কামেল দরবেশের কথা অবগত হয়ে মহাত্মাঃ উক্ত দরবেশের খানকায় উপস্থিত হন।

একজন কঙ্কালসার অলৌকিক শক্তির অধিকারী দরবেশ তাঁদের প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে বলেন, হে দরবেশ মহোদয়গণ, তোমরা হয়ত আমার বর্তমান অবস্থার কথা জ্ঞাত হতে আগ্রহী। তবে মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

একদা আমরা দুই বন্ধু একটি কবরের পার্শ্বে বসে কথোপকথনেরত ছিলাম। বন্ধুর একটি কথার দরুণ আমার ভীষণ হাসি পায়। ইত্যবসরে উক্ত কবর হতে আওয়াজ আসল “হে অবহেলাকারী, এক সময় তোমাদেরও এ রকম কবরে বাস করতে হবে। কবরের ফেরেস্তা আজাব প্রদান করার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে আছে।

উক্ত আওয়াজ শ্রবণ করার পর হতে চল্লিশ বৎসরাবধি এ স্থানে অবস্থান পূর্বক আহাজারীর মাধ্যমে খোদার ধ্যানে রত আছি। শেষ বিচারের কালে কিভাবে খোদাকে চেহারা দেখাই সেই লজ্জায় অদ্যাবধি উপরের দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করি নাই।

### গোরস্থানে আহাৰ করা গুণাহ

খাজা (রঃ) বলেন, গোরস্থানে পানাহার করা শক্ত গুণাহ। হজুর (দঃ) এর হাদিস শরীফে আমি দেখেছি যে, যদি কোন ব্যক্তি নিষ্প্রয়োজনে গোরস্থানে বসে পানাহারে লিপ্ত হয়, সে “মালাউন” “মোনাকফক”।

### হাসি ঠাট্টা এবং চিত্ত বিনোদন বর্জনীয়

তিনি বলেন, “রেয়াহীন” নামক কেতাবে উল্লেখ আছে যে, একদা হজুর (দঃ) কোন স্থানে গমন কালে খেলাধুলায় এবং হাসি ঠাট্টায় রত একদল লোককে প্রত্যক্ষ করে বলেন, “ভাই সব, তোমাদের বোধ হয় মৃত্যু ভয় নাই, যার জন্য অবহেলিতগণের ন্যায় খেলাধুলায় মগ্ন হয়ে আছ”। উক্ত বাণী শ্রবণের পরে উক্ত লোকেরা আর কোনদিন অনুরূপ কার্য করেন নাই। অনর্থক কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া বড় গুণাহ।

তিনি বলেন, কোরআন পাকে উল্লেখ আছে কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া বা অনর্থক হয়রাণী করা বড় ধরনের পাপ।

তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, একদা একজন বাদশাহ স্বীয় প্রজাগণকে অনর্থক হয়রাণী করত বিধায়, আল্লাহ তাআলা তাকে নিদারুণ অনুকণ্ঠে সম্মুখীন করে, পরে বাদশাহী মসনদ হারিয়ে বাগদাদে অবস্থিত “মসজিদে কক্‌ড়ী” এর দরওয়াজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে থাকত।

কোন ব্যক্তি তার এ অবস্থা হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলতো “আমি প্রজাগণকে অনর্থক হয়রাণী করার কারণে, খোদা আমার এ অবস্থা করেছেন।

অপর একটি ঘটনা উল্লেখ করে খাজা সাহেব বলেন “আমি বাগদাদে অবস্থান কালীন সময়ে দজলা নদীর নিকটে তপস্যায় রত একজন কামেল দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ প্রার্থী হলে তিনি অত্যন্ত হৃদয়তার সাথে আমাকে স্বাগত জানান। আলাপ প্রসঙ্গে উক্ত দরবেশ মহোদয় বলেন, “আমি ৫০ বছর যাবত এ স্থানে অবস্থান করে খোদার ধ্যানে রত আছি, হয়ত চলার পথে আবারও গলতি করে বসি এ ভয়ে। এখানে অবস্থান গ্রহণ করার পূর্বে আমি যখন শিক্ষা সফরে বাহির হই, আমার যাত্রা পথের ধারে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অনর্থক কষ্ট দিতেছিল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সমস্ত কিছু অবলোকন করার পরেও নিশ্চুপ অবস্থায় সেই স্থান অতিক্রম করে চলে যাই। পরক্ষণে গায়েব হতে আওয়াজ আসল “হে খোদার বান্দা, তোমার কি উচিৎ ছিল না অন্যায়কারীকে খোদার ভয় প্রদর্শন করা”? সে যাবত আমি খোদার ভয়ে সন্ত্রস্ত। এমতাবস্থায় মাগরিবের নামাযের সময় হলে, গায়েব হতে এক পেয়ালা পানি দুইখানা যবের রুটি এবং নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্যে পরিপূর্ণ একখানা থালা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হল। উক্ত সুপেয় পানি এবং সুস্বাদু খাদ্য দ্বারা ইফতার করার পরে উভয়ে

এক সাথে নামায আদায় করি। পরে বিদায় গ্রহণের অভিপ্রায় জানালে মহাত্মা জায়নামাযের নিচ হতে দুটি আপেল দান করে আমাকে বিদায় সঞ্জাষণ জানান।

### কুরআণ শরীফ পাঠের উপকারিতা

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) কুরআন শরীফ পাঠের উপকারিতা সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলেন, কুরআন শরীফ পাঠ করার সময় খোদার প্রতি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে কায়মনোবাক্যে অত্যন্ত কোমল হৃদয়ে পড়া দরকার। কুরআন পাঠে ঈমানের সমৃদ্ধি ঘটায় এবং অসৎ কর্ম হতে বিরত রাখে। কুরআন পাক তেলাওয়াতের সময় হাসি ঠাট্টা করা কবীরাহ গুণাহ। কুরআন পাক তেলাওয়াতে ঈমান সমৃদ্ধ হয়। ইমাম জাহেদ (রঃ) তাঁর তফসীরের কেতাবে উক্ত বক্তব্য ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করেছেন।

এর পর খাজা সাহেব একটি “ছামা” বা কাওয়ালীর আসরের বর্ণনা করে বলেন, কোন এক সময় তিনি এবং কয়েকজন প্রসিদ্ধ দরবেশ এক “ছামা” মজলিসে উপস্থিত ছিলেন।

কাওয়াল আল্লাহর প্রশস্তি মূলক একখানা কবিতা পাঠ আরম্ভ করলে, তিনি ক্রমাগত ভাবে ৭ দিন বেখোদী অবস্থায় নিমজ্জীত থাকেন। ৭ দিন অতিবাহিত হবার পর লক্ষ্য করা গেল যে, কয়েকজন দরবেশের কেবল মাত্র পরিত্যক্ত জামা কাপড় অবশিষ্ট রয়েছে।

তাঁদের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নাই। তাঁদের অবস্থা সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলাই জ্ঞাত। এ পর্যন্ত বলে তিনি কুরআন পাক তেলাওয়াতে মগ্ন হয়ে পড়েন।

### ৫ম মজলিস

উক্ত মজলিসে খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (রঃ), শেখ জালাল (রঃ), শেখ আলি চিশ্তী (রঃ), শেখ মোহাম্মদ ওয়াহেদ চিশ্তী (রঃ)

প্রমুখ মহাআগণ ব্যতীত বহু সংখ্যক দরবেশ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনার সূত্রপাতে গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন উত্তরসুরী বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গ ৫টি জিনিসকে এবাদত মনে করতেন।

যেমন সরল অন্তঃকরণে মাতাপিতার চেহারা দর্শন করা, কুরআন শরীফ দর্শন করা, আলেম সমাজকে সুনজরে দেখা, কাবা শরীফ দর্শন করা, স্বীয় পীর-মোর্শেদকে দর্শন করা।

উক্ত বিষয় সমূহ বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, হযূর (দঃ) ফরমায়েছেন, যদি কোন সন্তান তার মাতা-পিতাকে আল্লাহর ওয়াস্তে দর্শন করে, তাহলে একটি মক্বুল হজ্জের সওয়াব অর্জিত হয়। তিনি অনেক প্রকার দৃষ্টান্ত দান করেন। কিন্তু পুস্তকের পরিসর বৃদ্ধির ভয়ে মাত্র একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করলাম। একদা হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ)কে কতিপয় লোক জিজ্ঞাসা করল যে, আপনার আধ্যাত্মিক জগতে সাফল্যের পশ্চাতে কোন আমলটি বিশেষ স্মরণীয়।

তদুত্তরে বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) বলেন, আমি বাল্য অবস্থায় কুরআন পাক অধ্যয়ন কালে আমার ওস্তাদ যখন **وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** (“ওয়াবিল ওয়ালেদাইনে এহসানা”) পাঠ দেন, তখন আমি মজ্বব হতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে জননীর চরণ যুগল স্পর্শ করে অত্যন্ত মিনতিভরে আরয করলাম, মা আমাকে আর্শীবাদ করুন, যেন পরম করুণাময় আমাকে আপনার খেদমত করবার শক্তি দান করেন। মাতা উক্ত বাক্য শ্রবণে আবেগপূতভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করে দরবারে এলাহীতে আমার অনুকূলে দোয়া করেন।

একদা প্রচণ্ড শীতের রজনীতে মাতা পানি পান করবার আগ্রহ প্রকাশ করাতে আমি পানি আনয়ন করে দেখলাম জননী নিদ্রিত হয়ে পড়েছেন। মাতার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটানোর আশঙ্কায় জননীর শিয়রে পানির পেয়ালা হস্তে দণ্ডায়মান অবস্থায় রইলাম, কারণ কখন জননী গাত্রোত্তান পূর্বক পানি পান করতে চাহেন। তিনি জাগরিত হয়ে যখন আমাকে উক্ত অবস্থায় দেখলেন,

তখন হতবাক হয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাকে ক্রোড়ে বসিয়ে চুম্বন করতে থাকেন; খোদার দরবারে আমার অনুকূলে দোয়া করলেন, যেন আমি খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারি। কেবলমাত্র জননীর নেক দয়ার বদৌলতে আল্লাহপাক আমাকে অফুরন্ত নেয়ামত দান করেন।

### কুরআন পাক দেখা ও পাঠ করা

খাজা সাহেব বলেন, কুরআন পাক দর্শনে এবং পাঠে আল্লাহতায়াল্লা প্রতিটি হরফের জন্য দশটি নেকী তান করেন। দর্শন এবং পাঠকারীর আমল নামা হতে ১০টি করে পাপ গোচন করে দেন।

ইত্যবসরে খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) আরয করেন সফরের সময় কুরআন পাক সঙ্গে রাখা যাবে কিনা? খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন, গ্রাক ইসলাম যুগে বিধর্মীগণের হস্তে কুরআন পাকের অবমানার আশঙ্কায় হুজুর পাক (দঃ) সফরকালীন সময়ে কুরআন পাক সঙ্গে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটবার পরে আর বারণ করেন নাই। তৎপ্রসঙ্গে তিনি অনেকগুলি ঘটনার বর্ণনা দান করেন। কিন্তু আমি কেবলমাত্র একটি ঘটনার বিবরণ দান করলাম।

সুলতান মাহমুদ গজনবী কুরআন পাকের খুবই কদর করতেন। একদা কোথাও যাত্রাকালে এক গৃহস্থ নিবাসে মেহমান হন। গৃহস্থামী অত্যন্ত মার্জিত ভাবে সুলতানের বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সুলতান শয়ন করতে গিয়ে দেখেন যে, তাঁর পালঙ্কের পায়ের দিকে তাকের উপর কুরআন পাক রাখা হয়েছে। তিনি কুরআন পাকের অবমাননার ভয়ে পূর্ণ রাত দণ্ডায়মান অবস্থায় কাটান। ইহ জগৎ ত্যাগ করার পরে কয়েকজন লোক তাঁকে স্বপ্নে দর্শন করে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ পাক তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন। তিনি বলেন খোদা আমাকে কুরআন পাকের ইজ্জতের প্রতিদান দিয়েছেন।

## আলেমগণের প্রতি সুনজরে দেখা

খাজা সাহেব বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আলেম এবং কামেল ব্যক্তিবর্গের প্রতি নেক দৃষ্টিতে দেখে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি এক হাজার বছর এবাদতের সমান সওয়াব প্রাপ্ত হয়। উক্ত অবস্থায় মৃত্যু হলে, উক্ত পূণ্যাত্মা ব্যক্তিবর্গের সাথে তার হাশর হবে।

কোন এক সময়ে একব্যক্তি আলেম, কামেল ব্যক্তিগণকে খুবই ঘৃণা করত। এমনকি তাঁদের চেহারা দর্শন থেকে স্বীয় চেহারা ঘুরিয়ে রাখত।

তার মৃত্যু হলে কবরস্থ করার পর যখন লোকজন তার চেহারা কেবলা মুখী করতে গেল, অনেক কসুরতের পরেও তা সম্ভবপর হল না। উপরন্তু গায়েব হতে আওয়াজ হল “মুসলমানগণ, তোমাদের অনবরত চেষ্টাতেও তার চেহারা কেবলা মুখী করা যাবে না, কেননা সে জীবিত অবস্থায় আমার প্রিয় বান্দাদের দর্শন করলে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিত। সেহেতু তার এই পরিণতি।

## কাবা শরীফের দিকে দৃষ্টি দেয়া

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন, কাবা শরীফের দিকে দৃষ্টি দেয়া বড় সওয়াব। এর স্বপক্ষে হজুর (দঃ) ফরমায়েছেন, যদি কোন ব্যক্তি পবিত্রতার সাথে সরল অন্তঃকরণে খানায় কাবার প্রতি দৃষ্টি দেয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তির আমলনামায় এক হাজার বছর এবাদতের সমান সওয়াব লেখা হয়। উপরন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ হজ্বের সওয়াব মিলবে।

## পীর-মোর্শেদের খেদমত করা

খাজা সাহেব বলেন স্বীয় পীরের সেবাকারীর অনেক সওয়াব মিলে।

তিনি বলেন, “আমি হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) এর নিকট হতে শ্রবণ করেছি যে, যদি কোন মুরীদ স্বীয় পীরের আদেশ নির্দেশ ইত্যাদি

পালন পূর্বক অকুষ্ঠচিত্তে পীরের সেবা করে, আল্লাহতাআলা তাকে অবর্ণনীয় সওয়াব দান করেন। তদুপরি উক্ত ব্যক্তির আমলনামায় এক হাজার বছর এবাদতের সমান সওয়াব এবং তার সেবার জন্য এক হাজার হুর মিলবে। অতঃপর তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে, পীর কর্তৃক নির্দেশিত নামায়, রোযা, অজীফা, আমালীয়াত ইত্যাদি আন্তরিকতার সাথে পালন পূর্বক, যথা সম্ভব পীরের দরবারে উপস্থিত থাকার জন্য উপদেশ দান করেন।

তৎপ্রসঙ্গে একটি কাহিনী উত্থাপন করে তিনি বলেন, কোন এক সময় একজন কামেল দরবেশ দিনে রোজা এবং রাতে নফল এবাদতের মধ্য দিয়ে একশত বছর বয়স কালে পরলোকগমন করেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে স্বপ্নে দর্শন করে তাঁর বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে চাইলে; তিনি বলেন, তার শত বছর এবাদত অপেক্ষা পীরের সেবা অনেক মূল্যবান। এর পরে তিনি বলেন, হাশরের ময়দানে পীর মোর্শেদগণ বহু সংখ্যক জিজ্ঞীর দ্বারা সজ্জিত থাকবেন। পীর-মোর্শেদগণের উক্ত জিজ্ঞীরকে আশ্রয় করে মুরীদানগণ অনায়াসে পুল সেরাতের সেতু অতিক্রম করে বেহেস্তে প্রবেশ করবে।

উক্ত বক্তব্য পেশের পরে তিনি কালাম পাক তেলাওয়াতে মগ্ন হয়ে পড়েন।

## ৬ষ্ঠ মজলিস

এ মজলিসে হজরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) হযরত শেখ ইস্পাহানী (রঃ) শেখ বোরহানুদ্দীন চিশতী এবং আরও অনেক দরবেশ মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) আল্লাহতাআলার কুদ্রত সম্বন্ধে আলোচনার মাধ্যমে মজলিসের উদ্বোধন করে বলেন, সৃষ্টির গূঢ় রহস্য যদি মানবের বোধগম্য হতো তবে মানুষ মাতাল হয়ে যেত।

তিনি বলেন, “আমি হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ) হতে শ্রবণ

করেছি যে, মানবকুলের জ্ঞাত ভূমণ্ডল সমূহে অজস্র মলায়েক্গণ কলেমা তৈয়বার জিকিরে মত্ত রয়েছেন।

উপরন্তু ভিন্ন ভিন্ন ফেরেশতাগণকে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করে মানবকুলকে আল্লাহর অস্তিত্বের কথা স্মরণ করে দিতেছেন। যেমন পানি এবং বায়ু একজন ফেরেশতা নিয়ন্ত্রণ করতেন। হাবীল নামক একজন ফেরেশতাকে নক্ষত্ররাজির নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে।

অতঃপর “কুহেক্লাফ” পাহাড়ের বিস্ময় এবং কষ্টের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, উক্ত পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতা “কারতাল” যখন পৃথিবীর স্নায়ু ধরে টান দেয়, তখন পৃথিবীতে পানির অভাব সৃষ্টি হয়। আবার স্নায়ু শ্লথ করে দিলে পানি বর্ষিত হয়, সমগ্র বিশ্ব সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা হয়ে রূপসী হয়ে উঠে। স্নায়ুতে ঝঙ্কারের সৃষ্টি করলে ভূকম্পন অনুভূত হয়।

তৎপ্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, একদা দৃষ্টি শক্তিহীন এক বৃদ্ধ হযরত খাজা ওসমান হারুণী (রঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে, আরজ করল যে, তার একমাত্র পুত্র ইউসুফ, আজ প্রায় ৩০ বৎসর অবধি নিখোঁজ। অতএব বৃদ্ধ অত্যন্ত কাতর ভাবে হযরত ওসমান হারুণী (রঃ)কে হারানো ছেলের অনুকূলে দোয়া করতে বলল।

হযরত ওসমান হারুণী বৃদ্ধের করুণ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে দোয়া করতে আগ্রহী হয়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকেও তাঁর সাথে দোয়ায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। দোয়া খতম করে তিনি বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে বললেন “যাও তোমার নিরুদ্দেশ ছেলে খোদার রহমতে ফিরে পাবে।

অত্যন্ত উৎফুল্লচিত্তে বৃদ্ধ স্বীয় আবাসস্থলে পৌঁছে দেখে যে, তার শক্তি দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে এবং নিরুদ্দেশ পুত্রও গৃহে ফিরে এসেছে। অত্যন্ত আবেগের সাথে পুত্রকে সাথে নিয়ে হযরত ওসমান হারুণী (রঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কদমবুচির মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

হযরত ওসমান হারুণী (রঃ) উক্ত ছেলেকে কিভাবে বাড়ী পৌঁছল জিজ্ঞেস করলেন। তদুত্তরে ছেলে বলল, হুজুর, প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে কয়েকজন জল দস্যু অপহরণ করে আমাকে একটি জাহাজে র মধ্যে পায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে।

অদ্য আকস্মিকভাবে দেখতে অবিকল আপনার চেহারার একজন ন বুজুর্গ ব্যক্তি আমাকে শৃঙ্খল মুক্ত করে বলেন, “নয়নদয় মুদিয়ে আমার পায়ের উপর পা স্থাপন কর” কিছুক্ষণ পর চক্ষু উন্মোচন করে লক্ষ্য করি যে, আপন বাসগৃহের নিকটে অবস্থান করতেছি। আমার দৃঢ় আস্থা যে, উক্ত বুজুর্গ আপনি ব্যতীত অন্য কেউ নন।

হজরত ওসমান হারুণী (রঃ) বললেন সমস্ত কিছু আল্লাহর কুদ্রত।

## ৭ম মজলিস

এ মজলিস খাজা বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) এবং কিছু সংখ্যক হাজীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

সূরা ফাতেহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) বলেন, যত রকম কঠিন বিপদাপদ হোক না কেন, সরল অন্তঃকরণে; কায়মনোবাক্যে সূরা ফাতেহা পাঠ করলে, ইনশাআল্লাহ বিপদ হতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

যথাঃ- بِسْمِ اللَّهِ এর শেষ বর্ণ م এর সাথে الْحَمْدُ যুক্ত করে পড়তে হয়। যেমন بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ এবং শেষে তিনবার امين বলতে হয়।

তিনি বলেন নবী করিম (দঃ) ফরমায়েছেন সুব্বা ফাতেহা সর্ব প্রকার ব্যাধির মহৌষধ। একদা জিব্রাইল (আঃ) হুজুর পাক (দঃ)কে বললেন, আল্লাহ গফুরুর রহীম উম্মতে মোহাম্মদী (দঃ) এর প্রতি একটি সূরা নাজে ল করেছে, যাতে সর্বপ্রকার রোগের শেফা অন্তর্নিহিত রয়েছে। ভূমণ্ডলের সমস্ত জলরাশিকে কালি এবং বৃক্ষাদিকে কলম হিসেবে

ব্যবহার করেও এর গুণগান বর্ণনা করা সম্ভব হবে না। যদি পূর্ববর্তী ঐশী কেতাব সমূহে উক্ত সুরা লিপিবদ্ধ হত, তা হলে তারা পথভ্রষ্ট হতো না। আল্লাহতায়ালার নৈকট্যলাভ সহজতর হবার জন্য উক্ত সুরা আপনার উন্মতগণের জন্য প্রেরিত হয়েছে।

গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন, যে কোন প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধিতে ফজরের সুন্নত নামাজের পরে এবং ফরজ নামাজের পূর্বে উল্লেখিত বিধান মতে ৪১ বার সুরা ফাতেহা পাঠ করে (প্রত্যেক বার শেষে আমীন বলতে হবে) দম করলে ইনশাআল্লাহ রোগ আরোগ্য হবে।

তৎপ্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেন, হযরত ফজল বিনু আয়াজ (রঃ) কর্তৃক বাদশাহ হারুনর রশিদের দুরারোগ্য পীড়া উপরোক্ত বিধান মতে তাঁর অঙ্গে হস্ত স্থাপন পূর্বক ৪১ বার সুরা ফাতেহা শরীফ পাঠ করে দম দেওয়ার পরে বাদশাহ সুস্থ হবার কাহিনীটি বর্ণনা করেন। অপর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, হযরত আলী (কঃ) সুরা ফাতেহা পাঠ করে দম দেওয়াতে এক ব্যক্তি কঠিন পীড়া হতে মুক্তি লাভ করে। আরোগ্যলাভকারীর এক বন্ধু এতে বিশ্বাস স্থাপন করতে অস্বীকার করায়; বন্ধুটি অনুরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

আল্লাহতায়ালার কোরান শরীফের প্রত্যেকটি সুরার ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদান করেছেন। কিন্তু সুরা ফাতেহাকে ৭টি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যথাঃ- (১) ফাতেহাল্ কেতাব (২) সবিলুল মাছনী (৩) উম্মুল কেতাব (৪) উম্মুল কুরআন (৫) সুরাহ্ মাগফেরাত (৬) সুরাতুর রাহমত (৭) সুরাতুল কন্জ।  
সুরা ফাতেহায় ৭টি বর্ণ বর্জিত। যথাঃ- ث, ج, خ, ز, ش, ظ, ف।

উক্ত বর্ণ সমূহ কেন বর্জন করা হয়েছে; এর ব্যাখ্যা দান করে তিনি বলেন-

ث- সবুর, সবুর অর্থ সর্বনাশ, উক্ত সুরাপাঠকারী ধংশের হাত হতে রক্ষা পায়।

ج- জাহান্নামের আদ্যাক্ষর। উক্ত সুরাপাঠকারী দোজখ হতে অব্যাহতি পায়।

خ- খোয়ার এর আদ্যাক্ষর। উক্ত সুরাপাঠকারী পেরেশানী হতে মুক্ত থাকে।

ز- জ-কুমের আদ্যাক্ষর। যে ব্যক্তি উক্ত সুরাপাঠ করবে সে কষ্ট হতে পরিত্রাণ পাবে।

ش- শাকাওয়াত-এর আদ্যাক্ষর। উক্ত সুরাপাঠকারী দুর্নাম হতে রক্ষা পাবে।

ظ- জুলমাতের আদ্যাক্ষর। যে ব্যক্তি উক্ত সুরা পাঠ করে, সে উৎপীড়নের কবল হতে মুক্ত থাকবে।

ف- ফরাকের আদ্যাক্ষর। উক্ত সুরাপাঠকারী অন্তের অভাবে কষ্ট পাবে না।

বিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ বলেছেন, সুরা ফাতেহায় ১২৪টি হরফ আছে। ধরনীতে আল্লাহতায়ালার এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর (দঃ) প্রেরণ করেছিলেন। প্রত্যেকটি হরফে ১ হাজার পয়গম্বর (দঃ) এর সওয়াব নিহিত আছে। সুরা ফাতেহা পাঠকারী উক্ত সওয়াব প্রাপ্ত হবে।

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) সুরা ফাতেহাকে কেন্দ্র করে বিস্তার আলোচনা করেছেন। পাঠকবৃন্দ সহযোগিতা করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে ব্যাপক বর্ণনার আকাঙ্ক্ষা আছে।

## ৮ম মজলিস

উপরোক্ত মজলিসে আতায়ের রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) তাত্ত্বিক আলোচনাকে প্রাধান্য দেন। তাঁর ১ম খলিফা খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (রঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, খাজেগানে চিশ্ত কর্তৃক নির্দিষ্ট আমালিয়াত এবং জিকির ইত্যাদি আমি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আদায় করি। তুমিও তা অবিকলভাবে পালন করবে। তিনি যে ধরণের তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন তা পালন করা একমাত্র পার্থী মোহ ত্যাগকারীর পক্ষেই সম্ভব।

উক্ত আমালিয়াত এবং অজিফা ইত্যাদি “দলীলুল আরেফীন” “হাশত বেহেশত” নামক কেতাবাদিতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। চিশ্তীয়া পন্থী

কামেল পীরের নৈকট্য ব্যতীত পুস্তক পাঠে তা আয়ত্ত্ব করা সম্ভবপর নয় বিধায়, আমি উক্ত বিষয়বস্তুর আলোচনা হতে বিরত রইলাম।

## ৯ম মজলিস

উক্ত মজলিসে হযরত খাজা বখ্তেয়ার কাকী (রঃ), হযরত শেখ ওয়াহেদুদ্দীন কিরমানী (রঃ), শেখ বোরহান গজনবী (রঃ) প্রমুখ মহাত্মাগণ ব্যতীত বহু সংখ্যক দরবেশ উপস্থিত ছিলেন।

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) মারেফতের তত্ত্ববিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, মারেফতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ফরমায়েছেন যে, মারেফতের সর্ব মোট একশাট স্তর আছে। উহার মধ্যে ৭০ স্তর কাশফ এবং কারামাতের জন্য নির্দিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে মারেফতের সর্বস্তর অতিক্রম না করা পর্যন্ত অলৌকিকতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। নেহায়েত দায়ে না ঠেকলে কেলামাত প্রদর্শন না করাই উত্তম।

তিনি বলেন মারেফতের সমুদয় স্তর অতিক্রম করার পরে অদৃশ্য ও অলৌকিক শক্তি দ্বারা কোন কার্য সমাধা করা সম্ভবপর হয়। তৎপ্রসঙ্গে হজরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) এর দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বর্ণনা করেন যে, একদা বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ)কে উদ্দেশ্য করে গায়েব হতে আওয়াজ আসছিল, হে বায়েজীদ এই মুহূর্তে দোয়া কবুলের শুভক্ষণ, অতএব কাম্য কিছু থাকলে বল।”

উক্ত আওয়াজ শ্রবণ করে আত্মভোলা অবস্থায় তিনি বললেন, তুমি সর্বাধিপতি ও সর্বজ্ঞ, আমি তোমার আজ্ঞাবহ গোলাম মাত্র। কিছু চাওয়া অবাঞ্ছিত। তুমি স্বেচ্ছায় কিছু দান করলে, উহা আমার পরম পাওয়া।

পুনরায় আওয়াজ আসল, “হে বায়েজীদ আমি তোমাকে মঙ্গলময় আখেরাত দান করলাম।” উক্ত বাক্য শ্রবণ করে বায়েজীদ (রঃ) বললেন উহাও কারাগার সদৃশ তথাপি তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য।

পুনরায় আওয়াজ আসল, হে বায়েজীদ পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে

তোমার আজ্ঞাবহ করে দিলাম” বায়েজীদ (রঃ) বললেন, “প্রভু তোমার সন্তুষ্টিই আমার কাম্য।

পুনরায় গায়েব হতে আওয়াজ আসল, হে বায়েজীদ তোমার অন্তরের অভিলাস ব্যক্ত কর। তদুত্তরে বায়েজীদ (রঃ) বললেন, “প্রভু তুমি সর্বজ্ঞ তোমার অগোচরে কিছুই নাই”।

পুনরায় গায়েব হতে আওয়াজ আসল, “তোমার কথা ধ্রুব সত্য, একমাত্র আমার নৈকট্য লাভই তোমার সন্তুষ্টি। কিন্তু বল দেখি, আমার নিকট আসলে তুমি কি করবে?”

তদুত্তরে বায়েজীদ (রঃ) আবেগপূত কণ্ঠে বললেন, প্রভু! তোমার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ করে বলতেছি যে, যদি তোমার নিকটে পৌঁছবার সুযোগ দাও, তবে শেষ বিচারের দিবসে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপে “আহ” আওয়াজ করব, যার পরিণামে উক্ত অগ্নিকুণ্ড শীতল হয়ে যাবে।

পুনর্বীর গায়েব হতে আওয়াজ হল, হে বায়েজীদ, তুমি নিশ্চিত হও, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করা হবে।

তৎপ্রসঙ্গে অপর একটি কাহিনী বর্ণনা করে খাজা (রঃ) বলেন, ইমাম গাজ্জালী (রঃ) হতে বর্ণিত, বাগদাদ শহরের প্রকাশ্য বাজারে এক ব্যক্তির হস্তপদ কর্তন করার পরে উপস্থিত লোকজন তাঁকে হস্তপদ কর্তনের সময় অসহ্য যন্ত্রণায় মধ্যে কিভাবে হাস্য অবস্থায় ছিল, জিজ্ঞেস করলে বললেন, যে উক্ত সময়ে আমার পরম মাহবুব চক্ষের সামনে বিরাজ করতেন বিধায় আমি কিঞ্চিৎ পরিমাণ যন্ত্রণাও অনুভব করিনি।

এর পরে খাজা সাহেব বলেন, অনর্থক কোন ব্যক্তিকে হয়রানী করা শক্ত গুণাহ।

তৎপর তিনি বলেন; “আমি হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) এর নিকট হতে শ্রবণ করেছি যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হলে আল্লাহ

তার নিকট হতে কোন কিছু অদৃশ্য রাখে না।

তিনি বলেন শেষ বিচারের দিবসে খোদা তার নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তিকে আহ্বান করে বলবে “তোমরা বেহেশতে গমন কর”।

তদুত্তরে মহাআগণ বলবেন, আমাদের পরম আরাধ্য তুমি। আমরা বেহেশতের জন্য লালায়িত নই। তোমাকে পেয়েছি; এটাই আমাদের চরম এবং পরম পাওয়া। বেহেশতের লোভে যারা তোমার এবাদত করেছে তাদেরকে তুমি বেহেশত দান কর।

যাঁরা আল্লাহর উঃর নির্ভরশীল তাদের নিকট বেহেশত কিংবা অন্য কোনরূপ নেয়ামত মূল্যবান। একদা এক ব্যক্তি মনসূর হেল্লাজ (রঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিল যে, প্রকৃত খোদা প্রেমিকের স্বরূপ কি? তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, বন্ধু কর্তৃক কষ্ট; যাতনা হর্ষ ও বিষাদ প্রভৃতিতে অবিচল থেকে সাহস এবং ধৈর্যের সাথে যে ব্যক্তি তার উপসনা হতে বিচ্যুত না হয়, সেই প্রকৃত ঐশী প্রেমিক, যে কোন প্রকার মোহ, লোভ, লালসা ইত্যাদি পরিত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে তার উপাসনায় মগ্ন থাকে।

## ১০ম মজলিস

এ মজলিসে খাজা কুতুবুদ্দীন বখতেয়ার কাকী ছাড়াও বহু সংখ্যক দরবেশ উপস্থিত ছিলেন। সৎ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উপর আলোকপাত করে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন, সৎসঙ্গে অবশ্যই মূল্য নিহিত আছে।

তিনি বলেন, সৎলোকের সাহচর্য সৎকর্ম হতে উত্তম। খারাপ লোকের সাহচর্য খারাপ কার্য করার চেয়েও মন্দ।

অতঃপর তিনি বলেন, হযরত শিবলী (রঃ) এর নিকট হতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল যে, নাফরমানি কাকে বলে?

তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, তৌবা করলে গুণাহ ক্ষমা করা হবে আশায় পুনঃ পুনঃ গুণাহ করতে থাকা, নাফরমানি।

তৎপর খাজা সাহেব বলেন, তিনি স্বীয় ওস্তাদ মৌলানা শরীফুদ্দীন (রঃ) কর্তৃক প্রণীত একখানি কেতাবে দেখেছেন যে, একদা একব্যক্তি হযরত আবুবকর শিবলী (রঃ) নিকট প্রশ্ন করে জ্ঞাত হতে চেয়েছেন যে, “হযরত, খোদার এবাদত করার পশ্চাতে আপনার ভীতিই কি মুখ্য?

জবাবে তিনি বলেছিলেন, হাঁ দুইটি বিষয়ে আমার খুব ভয়।

প্রথমত- ঈমানের সাথে যাতে মৃত্যুবরণ করতে পারি। অন্যথা সমস্ত এবাদত বৃথায় পর্যবসিত হবে।

দ্বিতীয়ত- নশ্বর দেহত্যাগ করার পরে যেন আল্লাহর নৈকট্য লাভে বঞ্চিত না হই। আল্লাহর নৈকট্য ব্যতীত আমি অন্য কিছু কল্পনা করতে পারি না।

তৎপর খাজা সাহেব ওমর ফারুক (রাঃ) এবং বাদশাহ হরমুজানের কাহিনীটি বর্ণনা করেন।

যুদ্ধ-বন্দী হিসেবে হরমুজান বাদশাহকে ২য় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর সম্মুখে উপস্থিত করা হলে তিনি বাদশাহের শিরোচ্ছেদের নির্দেশ প্রদান করেন। বাদশাহ হরমুজান হযরত ওমর (রঃ) এর নিকট এক পেয়ালা পানি পান করার অনুমতি প্রার্থনা করলে ২য় খলীফা প্রার্থনা মঞ্জুর করে এক পেয়ালা পানি প্রদান করার আদেশ দেন। বাদশাহ পানির পেয়ালাটি হাতে ধারণ করে খলীফাকে সম্বোধন করে বলেন, “হে আমীরুল মোমেনীন, পানি পান করার পূর্বে আমাকে হত্যা করা হবে বলে আমি ভীত।”

হযরত ওমর (রাঃ) বাদশাহকে অভয় দান করে বললেন, পানি পান করার পূর্বে হত্যা করা হবে না।

উক্ত অভয়বাণী প্রবণ করে বাদশাহ পানির বাটিটি ভূতলে নিক্ষেপ

করে দিলেন।

ফারুককে আজম (রাঃ) বাদশাহকে অনুরূপ আচরণের হেতু জিজ্ঞাসা করলে বাদশাহ বলেন, স্বীয় প্রাণ রক্ষার্থে পানি পান না করে ভূতলে নিষ্ক্ষেপ করেছি।

বাদশাহের জবাব শ্রবণ করে খলীফা মৃদু হেসে বাদশাহকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাকে পুনরায় স্বীয় রাজ্যে গমন করে রাজ্য শাসন করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করলে বাদশাহ বলেন, বর্তমানে উক্ত বাসনা হতে আমি মুক্ত। অনুগ্রহ পূর্বক আমার রাজ্য হতে একখানা বিরান {জনমানবহীন} গ্রাম প্রদান করা হোক, যার দ্বারা আমি জীবিকা নির্বাহ করতে পারি।

খলীফা অনুরূপ গ্রামের খোঁজে চতুর্দিকে অনুচর পাঠিয়ে বিফল মনোরথে বাদশাহকে বললো, আপনার রাজ্যে অনুরূপ গ্রাম পাওয়া যায় নাই। তখন খলীফাকে উদ্দেশ্য করে বাদশাহ বলেন, মহাশয় আমার রাজ্যে অনুরূপ গ্রাম পাওয়া দুষ্কর। আমার রাজ্য এখন মুসলমানগণের করতলগত। কাজেই মুসলমান শাসক মহোদয়ের নিকট আমার অনুরোধ, তাঁরাও যেন অনুরূপ ভাবে রাজ্য শাসন করেন। উক্ত বাক্য শ্রবণের পর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্তে বাদশাহকে আপনজন হিসেবে বরণ করে নেন।

গরীবে নেওয়াজ (রাঃ) অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, একদা একজন বুজুর্গ ব্যক্তি হযরত জুন নুন মিসরী (রাঃ) নিকট আরেফ কাকে বলে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলেন ৩টি বিষয়ের সমন্বয় যে ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান, সেই আরেফ। আরেফ পার্থিব জগতের শত্রু, কিন্তু বিধাতার প্রিয় ভাজন।

আরেফ পার্থিব জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন থাকে। কারণ এ ধরণীর বৃকে হিংসা বিদ্বেষ ব্যতীত আর কিছুই নাই।

যে ব্যক্তি পার্থিব জগতের মোহে মোহিত, সে আল্লাহর সান্নিধ্য হতে

ব্যবধানে অংশগ্রহণ করতেছে।

তৎপ্রসঙ্গে খাজা (রাঃ) অন্য একটি কাহিনীর বর্ণনা দান করে বলেন, একজন কামেল দরবেশ আপন কুটিরে সবসময় আল্লাহর আরাধনায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর নিকট যে সমস্ত হাদিয়া আসতো উহা আকাতেরে অভাব-গ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। তাঁর খানেকাহ হতে কোন ব্যক্তি অভুক্ত কিংবা রিক্ত হস্তে ফিরত না।

একদা দুইজন বুজুর্গ ব্যক্তি তাঁর নিকটে আতিথ্য গ্রহণ করলে এক পেয়ালা পানি দুখানা রুটি দ্বারা তাঁদের আপ্যায়ন করেন। ভোজনের পরে, করুণাময়ের নিকট শোকর গুজারী করে একে অপরকে বলতে লাগলেন “উনি আমাদের তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়েছেন। এখন আমাদের উচিত তাঁর অনুকূলে দোয়া করা।” প্রথম দরবেশ বললেন, পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত হবে। ২য় দরবেশ বললেন, এতে তিনি বিপথগামী হবেন।

১ম দরবেশ বললেন, পার্থিব সম্পদ দ্বারা তিনি পরজগৎ লাভ করবেন।

অতঃপর উভয় দরবেশ কায়মনোবাক্যে উক্ত দরবেশের অনুকূলে দোয়া করে বিদায় গ্রহণ করেন।

দরবেশদ্বয়ের বিদায় গ্রহণের পরবর্তীতে, উক্ত দরবেশের হাদিয়ার পরিমাণ এরূপভাবে বৃদ্ধি পায় যে, তাঁর লংগরখানায় প্রত্যহ হাজার লোকের অনু প্রস্তুত হয়ে মোসাহেরগণের ক্ষুধা নিবারণ করত।

গরীবে নেওয়াজ (রাঃ) আরও বলেন, ধন্যবাদ ঐ সমস্ত দরবেশগণকে, যারা অন্য দরবেশগণের সাথে সুসম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখে এবং একে অপরের সাথে নিয়মিত কুশল বিনিময় করে থাকে। ধিক্ ঐ সমস্ত দরবেশগণকে, যারা একে অপরের সংস্পর্শে আসে না এবং কুশল বিনিময় হতে বিরত থাকে।

এ প্রসঙ্গে একজন অন্ধ বুজুর্গ ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, আমি একদা একজন অন্ধ বুজুর্গের নিকট তার দৃষ্টিহীনতার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, “আমি প্রভুর নৈকট্যলাভ করার

### খাজা গরীবে নেওয়াজ ৮৭

পরেও যখন তার সৃষ্টির প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে লাগল, তখন এক রোজ গায়েব হতে আওয়াজ শ্রবণ করলাম “হে লোভাতুর! আমার বন্ধুত্বের দাবী করে অন্যের প্রতি কিভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।”

উক্ত আওয়াজ শ্রবণের পরে অত্যন্ত অনুতপ্ত ও বিষণ্ণ হৃদয়ে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে “হে প্রভু! যে নয়ন তুমি ব্যতীত অন্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সেরূপ নয়ন আমার প্রয়োজন নাই। অনুগ্রহ করে অবাধ্য নয়নের দৃষ্টিশক্তি হতে আমাকে বঞ্চিত কর।” বর্তমানে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রভুর উপসনায় রত আছি। বাহ্যতঃ আমি দৃষ্টিহীন হলেও অন্তঃদৃষ্টিতে সমস্ত কিছু উপলব্ধি করতে সক্ষম।

প্রকৃত ঐশী প্রেমিকের দৃষ্টান্ত দিয়ে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন, একদা হযরত দাউদ তায়ী (রঃ) মুদিত নয়নে স্বীয় ছজরা হতে বাহির আগমনকালে, উপস্থিত লোকজন অনুরূপ অবস্থার হেতু জ্বাত হবার আকাঙ্খা প্রকাশ করলে তিনি বলেন, আমি ৩৯ বছর যাবত অনুরূপ মুদিত নয়নে কালাতিপাত করে আসতেছি, যাতে বন্ধু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত না হয়। কেননা শেষ বিচারের দিবসে আল্লাহ এরশাদ করবে, উক্ত লোকগুলিকে অনুসন্ধান কর, “আমার বন্ধুত্বের দাবী করে যারা অপর বস্তুর প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে নজর করে স্বীয় কুপ্রবৃত্তির খায়েশ পূরণ করত।”

### ১১তম মজলিস

এ মজলিসে খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) ব্যতীত শেখ ওয়াহেদুদ্দীন কিরমানী (রঃ), মৌলানা বাহাউদ্দীন (রঃ) এবং আরও কিছু সংখ্যক বুজুর্গ ব্যক্তি বর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত মজলিসে খাজা সাহেব আরেফগণের তাওয়াক্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর নৈকট্যবান ব্যক্তিগণের কাছে তার সাহায্য ব্যতীত অপর কোনরূপ সাহায্য কল্পনা বহির্ভূত।

তিনি বলেন, একদা হযরত জুনাইদ বোগদাদী (রঃ)কে আরেফগণের তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তদুত্তরে তিনি বলেন, আরেফগণকে তিনটি

### খাজা গরীবে নেওয়াজ ৮৮

বস্তুর প্রতি নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করতে হবে। যথা- বিদ্যা, আমালিয়াত এবং কামেলিয়াত।

অপর একজন বুজুর্গ ব্যক্তিকে উপরোক্ত প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, প্রকৃত আরেফ আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও সাথে বন্ধুত্ব কামনা করে না।

গরীবে নেওয়াজ (রঃ) পুনরায় বলেন, আমি অপর একজন বুজুর্গ ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করেছি যে, প্রকৃত আরেফ মৃত্যুকে পরমাত্মীয় মনে করে। সর্বক্ষণ আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকে এবং নৈকট্য লাভের জন্য উৎসুখ থাকে।

অতঃপর তিনি বলেন, একদা জিব্রাইল (আঃ) হজরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, “হে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ, আপনার অভাব পূরণার্থে আমি কি কিছু সাহায্য করতে পারি? তদুত্তরে ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, তোমার কোনরকম সাহায্য গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত নাই। কারণ স্বয়ং আল্লাহতাআলা যেখানে সর্বজ্ঞ এবং সব রকমের অভাব পূরণকারী, সেখানে কেন আমি অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থী হব?”

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) আরও বলেন, আমি হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) হতে শ্রবণ করেছি যে, উত্তরসূরী বুজুর্গগণ আল্লাহর সখ্যতা ব্যতীত অপর কোন বস্তুকে প্রেম নিবেদন করেন নি। যাদের দৃষ্টি অন্যের প্রতি প্রলুব্ধ হয়েছে তারা বিপদগামী হয়েছে।

অতঃপর তিনি বলেন, যদিকে তাকাই কেবলমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করি। উক্ত বাক্য উচ্চারণ করে তিনি বলেন “আস্‌রারুল আওলীয়া” নামক কেতাবের মহক্বত অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, রোজ হাসরে, আল্লাহর নৈকট্যবান ব্যক্তিবর্গের চেহারা স্বয়ং প্রভুর রূপে রূপান্তরিত করে পূর্ণজীবিত করবেন।

তিনি বলেন, হযুর (দঃ) যখন মেরাজ শরীফে গমন করেছিলেন, তখন কেবলমাত্র আল্লাহর তজল্লী এবং অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোনরূপ

বস্তুর অস্তিত্ব অবলোকন করেননি।

অতঃপর তিনি স্বর্ণ এবং রৌপ্যের অভাবনীয় কদরের বিশ্লেষণ করে বলেন, আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)কে যখন আল্লাহজালাল শানুহ বেহেশত হতে ধরাতলে আগমনের নির্দেশ দেন, তখন সৃষ্টির সমুদয় বস্তু রোদন করতে থাকে। কিন্তু স্বর্ণ এবং রৌপ্য রোদন হতে বিরত ছিল বিধায় আল্লাহতাআলা এর হেতু জিজ্ঞেস করায়, স্বর্ণ রৌপ্য জবাব প্রদান করেছিল যে, “আপনার নির্দেশে যা সংগঠিত হয়েছে, এর বিপরীতে রোদন করা আমরা সমীচীন মনে করি নাই।” তখন আল্লাহতাআলা জালালীয়াতের শপথ করে বলে; আমি তা-কেয়ামত আদম সন্তানগণের অন্তরে তোমাদের চাহিদার বীজ বপন করে দিলাম।

তৎপর খাজা সাহেব বলেন, অক্ষম ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় বাক্যে অটল থাকে না। তিনি আরও বলেন, দরবেশগণ ভীতি ভালবাসা এবং সন্তুষ্টির কিভাবে বিশ্লেষণ করেছিল এর বর্ণনা দান করে বলেন- দরবেশগণের দৃষ্টিতে ভীতির মাধ্যমে যেভাবে দোজখের কঠিন আজাব হতে রেহাই পাওয়া সম্ভব, সেভাবে কাজ করা এবং পাপমুক্ত অবস্থায় জীবনযাপন করা।

সন্তুষ্টি উহাকে বলে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর উপাসনা করা, যাতে লক্ষ্য বস্তুর কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছা সম্ভব হয়।

নিষ্কলুষ প্রেমিক সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি বলেন যে, শেষ বিচারের দিবসে আল্লাহতাআলা নিষ্কলুষ প্রেমিকদের এবং খাদ বিশিষ্ট প্রেমিকদিগকে পৃথক করে দিবেন।

## ১২তম মজলিস

এ মজলিস বহু দরবেশ এবং বহুসংখ্যক আগন্তুক ও খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) এর উপস্থিতিতে একদা বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে আজমীরের জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত গুরুত্বপূর্ণ মজলিসে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) আকারে

ইঙ্গিতে অনেক বক্তব্য পেশ করেছিলেন। যার ফলাফল কিছুদিন অতিক্রান্ত হবার পর সকলের বোধগম্য হয়েছিল।

তিনি সর্বাত্মে “মালেকুল মউত” প্রসঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করে বলেন “মালেকুল মউত” ব্যতীত এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মূল্যহীন।

হজুর পাক (দঃ) ফরমায়েছেন, মৃত্যু একটি সেতু বিশেষ। যা দুই বন্ধুর মিলন ঘটায়। প্রকৃত বন্ধুত্ব উহা, যে বন্ধু প্রাণের সঞ্চারণ করেছে উক্ত প্রাণ দ্বারা দাতা বন্ধুর চতুষ্পার্শ্বে দক্ষিণ করা।

স্বয়ং আল্লাহতাআলা ফরমায়েছেন হে মানবকুল, “মোমেন” যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে থাকি।

তৎপর খাজা সাহেব বলেন, আল্লাহতাআলা আরেফগণকে এ জন্য পয়দা করেছেন, যাতে তাঁরা আল্লাহর মহিমা চতুর্দিকে প্রচার করেন।

উপরোক্ত বাক্যালাপের পর মুহূর্তে অশ্রুসজল নয়নে বলতে লাগলেন, বিধাতা যে আমাকে এই ধরাতলে প্রেরণ করেছেন, উহার অর্থ এটা নয় যে, আমি চিরঞ্জীব। হয়ত আমাকেও কিয়ৎকালের মধ্যে প্রভুর নিকট গমন করতে হবে।

উক্ত মজলিসে হযরত শেখ আলি সঞ্জরী (রঃ)-ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন, আমার “অসীয়াত নামা” লিপিবদ্ধ কর এবং উহা কুতুবুদ্দীনের হস্তে অর্পণ কর। আমি তাকে খেলাফত প্রদান করতেছি এবং তাকে দিল্লীতে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করতেছি। “অসীয়াত নামা” লেখা সম্পন্ন হবার পরে খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (রঃ)কে খাজা সাহেবের পাশে যাবার জন্য আদেশ প্রদান করবার পরে বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) অত্যন্ত সন্ত্রমের সাথে খাজা সাহেবের পাশে গমন করে আসন গ্রহণ করেন।

খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) বলেন, হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) স্বহস্তে আমার মস্তকে পাগড়ী পরিধান করিয়ে দেন। তাঁর পীর ও মোর্শেদ হতে প্রাপ্ত যষ্ঠি, আলখাল্লা এবং খাজা গরীবে

নেওয়াজ (রঃ) এর জায়নামাজ, কালাম পাক ইত্যাদি প্রদান পূর্বক আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, উক্ত পবিত্র বস্তু সমূহ আমার নিকট হুজুর পাক (দঃ) এর গচ্ছিত সম্পদ, যা আমি খাজেগানে চিশ্তগনের বদৌলতে প্রাপ্ত হয়েছি।

উক্ত প্রথা অব্যাহত রাখবার মানসে এ অমূল্য সম্পদ সমূহ তোমার করকমলে অর্পণ করলাম। আমি যে ভাবে উক্ত সম্পদের মর্যাদা দান করেছি, আশাকরি তুমিও উহার ব্যতিক্রম করবে না। উহার অপব্যবহার করে হাশরের ময়দানে খাজেগানে চিশত বুজুর্গগণের সামনে আমাকে লজ্জিত করবে না।

অতঃপর গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করলাম, সব সময় আমার চারিটি উপদেশ স্মরণ রাখবে, যথা-

- (১) যত অভাবের মধ্যেই কালাতিপাত কর না কেন, এমন ভাবে চলাফেরা করবে যাতে তোমাকে অভাবগ্রস্ত মনে না হয়।
- (২) ক্ষুধার্তকে উদরপূর্ণ করে অনু প্রদান করবে।
- (৩) সর্বাবস্থায় চিন্তামগ্ন থাকবে।
- (৪) শত্রুতার জবাব বন্ধুত্বের মাধ্যমে প্রদান করবে।

খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী বলেন, ইত্যবসরে আমার বোধোদয় হয় যে, দিল্লী গমনের অনুমতি লাভ পূর্বক যাত্রা করা প্রয়োজন। রওশন জমীর, খাজায়ে খাজেগান, আতায়ে রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর অন্তর দৃষ্টিতে আমার মনোভাব বুঝতে পেরে, নিকটে আহ্বান করেন। আমি নিকটে গমন করে কদমবুছি গ্রহণ করবার পরে তিনি দোয়া পাঠ করেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, চিন্তা বা দুঃখ কর না সাহসের সাথে অগ্রসর হও এবং বিচক্ষণতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তেয়ার কাকী বলেন আমি দিল্লী আগমণ করার পরে, তথাকার আপামর জনসাধারণ এবং সুধীবৃন্দ অত্যন্ত হৃদয়তার সাথে আমাকে স্বাগত জানায়।

দিল্লী আগমণের ৪০ দিন পরে বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হই যে, আমি আজমীর হতে প্রস্থানের ২০ দিন পরে, ইসলামের মহান সিপাহসালার, তাপসকুল শিরমনি,

খাজায়ে খাজেগান, আতায়ে রসুল, হজরত খাজা গরীবে নেওয়াজ, মঈনুদ্দীন হাসান চিশ্তী সঞ্জরী, আজমীরী (রঃ) অসংখ্য অনুরক্ত ভক্তগণকে শোক সাগরে ভাসিয়ে জন্মাতবাসী হন। (ইন্লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন)।

উক্ত দিবাগত রাত্রে জায়নামাজে তন্দ্রাভিত্ত অবস্থায় খাজায়ে খাজেগান, আতায়ে রসুল, খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বেশারত ফরমালে, আমি অত্যন্ত আদবের সাথে তার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে, তিনি বলেন, “আল্লাহ আমাকে তার রহমতের ছায়ার নীচে স্থান দিয়েছেন, এবং আরশ ও ফেরেশতগণের মাঝখানে আমার স্থান নির্ধারণ করেছেন।

আমি পুস্তকের প্রারম্ভে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উল্লেখ করেছি যে, আধ্যাত্মিক জগতের প্রখ্যাত মহাত্মাগণের সহচার্য ব্যতীত, কেবলমাত্র বই, পুস্তক পাঠ করে মারফতের জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ ব্যাপার। উক্ত রাস্তায় বিচরণের জন্য গাইড হিসেবে জ্ঞান অর্জনের জন্য পুস্তকখানা অবশ্যই সহায়ক হবে ইন্শাআল্লাহ।

এবার খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) কর্তৃক খাজা বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) এর নিকট প্রেরিত কয়েকটি আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত লিপি নিয়ে লিপিবদ্ধ করলাম।

## ১ম লিপি

আল্লাহর প্রিয় প্রেমিক, আমার প্রাণাধিক ভাই খাজা কুতুবুদ্দীন (রঃ), তোমার অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সেই ব্যক্তিই জ্ঞানী, যে ব্যক্তি বিলাসিতা ও অনাকাঙ্ক্ষাকে মজ্জাগত করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে আকাঙ্ক্ষা অনাকাঙ্ক্ষায় পর্যবসিত। অন্য দিকে অনাকাঙ্ক্ষাই আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্যস্থল। বহু ব্যক্তি সুস্থতার অপব্যবহার করে বিপদগামী হয়েছে।

মোদ্দাকথা জ্ঞানী সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না করে ত্যাগী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল অবস্থায় কেবলমাত্র তার উপাসনায় জীবন উৎসর্গ করতে সক্ষম হয়েছে। অনুরূপ জীবন স্থাপনে অভ্যস্ত হতে পারলেই আল্লাহর করুণা লাভে কোন সন্দেহ নাই।

স্রষ্টা চিরঞ্জীব এবং চিরস্থায়ী। তার ক্ষয় কিংবা পরিবর্তন নেই।

আমাদের উচিত কেবলমাত্র নয়নদাতার প্রতি নজর দেওয়া এবং পরজগতে মাহাত্মা ব্যতীত অপর কোর্নরূপ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত না করা।

যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি কেবল তার অস্তিত্বই অনুভব করি। ইহা অপেক্ষা আর অতিরিক্ত কি লিখব।

## ২য় লিপি

আমার আন্তরিক বন্ধু ও প্রাণাধিক প্রিয় ভাই কুতুবুদ্দীন দেহলভী (রঃ), আল্লাহ আপনাকে ইহ ও পরজগতের শান্তি দান করুক।

খোদার কাঙাল ও গোলাম মঈনুদ্দীনের নিকট হতে সালাম এবং দোয়ার পর, খোদার খোদায়ী সম্বন্ধে সামান্য বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতেছি। উহা তোমার অনুরক্ত ভক্ত মুরীদান এবং খোদা প্রেমিক ছাত্রগণকে অবগত করানো প্রয়োজন, যাতে তারা বিপদগামী না হয়।

হে প্রিয়! যে ব্যক্তি আল্লাহকে পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, সে ব্যক্তি কস্মিনকালেও কোন বস্তুর ফরিয়াদ বা লোভ লালসার বশীভূত হবে না।

যে ব্যক্তি খোদার পরিচয় লাভ করতে অসমর্থ, সে ব্যক্তি ইভ্রাফার উক্তির মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। স্বীয় আশা আকাঙ্ক্ষাকে পরিহার করা উচিত! কেননা প্রবৃত্তিকে কঠোর হস্তে দমন করতে অপারগ হলে লক্ষ্যস্থলে পৌছান অসম্ভব। অনুরূপ ব্যক্তিবর্গের জন্য আল্লাহতায়ালার পবিত্র বাণীই উজ্জল দৃষ্টান্ত

وَنَهَى نَفْسَهُ عَنِ الْفَوَاحِشِ الَّتِي كَانَتْ تَنفُسُهُ يَوْمَئِذٍ مَّيْلًا إِلَى الْمَأْوَى

অর্থাৎ যে স্বীয় রিপূর বশবর্তী হয়ে চলা হতে বিরত, তার গন্তব্যস্থল “বেহেশত”। যে ব্যক্তির অন্তর আল্লাহতায়ালার তার তরফ হতে অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখেছে, সেই ব্যক্তিকে চেষ্টা এবং ইচ্ছার কাফন পরিয়ে সমাধিস্থ করাই শ্রেয়। একদা হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ)কে আল্লাহতায়ালার স্বপ্ন যোগে বলেছিল বায়েজীদ, তোমার কি আকাঙ্ক্ষা আছে? বোস্তামী (রঃ) বললেন, প্রভূ! যাহা তোমার অভিপ্রায়। পুনর্বীর আল্লাহর নিকট হতে আওয়াজ আসল “বেশ তুমি যেরূপ আমার, আমিও তদ্রূপ তোমার।”

আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার ইচ্ছা থাকলে বা মারেফতের জ্ঞান আহরণের

অভিলাসী হলে, বাহ্যিক মনোবাসনা ত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতে হবে। আল্লাহর কাছে দেহ মন সমর্পণ করে তার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করতে পারলে ইনশাআল্লাহ শয়তানের প্ররোচনা হতে রক্ষা পাওয়া যাবে, ইহ ও পরজগতের সাফল্যতা অর্জন সহজ হবে। যে কোন রকম পরিস্থিতিকে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত পুরস্কার হিসেবে সাদরে বরণ করে হৃষ্টচিত্তে কালাতিপাত করতে হবে। সমুদয় এবাদতের সারাংশ হল, যে ব্যক্তি সবার বা ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরতে সমর্থ হয়েছে, সে ব্যক্তি দোজাহানের বাদশাহে পরিগণিত হয়েছে। উপরন্তু পার্থিব জগতের বাদশাহগণ তাঁর অনুগ্রহের পাত্র।

একদা আমার পীর ও মোর্শেদ আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে, বহু কামেল ব্যক্তিবর্গ বলে থাকেন, ওলীত্ব প্রাপ্ত হলে আর ভয়ের কোন কারণ নাই। আবার অনেকেই বলে থাকেন যে, খোদার নৈকট্য লাভের পরে আর এবাদত বন্দেগীর প্রয়োজন নাই; উহা সর্বোত্তমভাবে ভগ্নামী ব্যতীত আর কিছুই নয়। সরকারে দোজাহান হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) কামেলিয়াতের শীর্ষস্থানীয় হওয়া সত্ত্বেও সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপাসনায় মগ্ন থাকতেন।

বারেগাহে এলাহীতে তিনি فاعْبُدُونِكْ حَقَّ عِبَادَتِكَ বলে সর্বক্ষণ প্রার্থনা করতেন। (অর্থাৎ হে খোদা, আমি তোমার এবাদত পরিপূর্ণতার সাথে সম্পন্ন করতে পারি নাই! যেভাবে এবাদত করা আমার উচিত ছিল।”)

তিনি সর্বাবস্থায় অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কলেমায়ে শাহাদত পড়তেন-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

(অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অপর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ) তোমার আস্থা থাকা প্রয়োজন। তাপস যখন আধ্যাত্মিক জগতের চরম শিখরে পৌঁছে, তখন উক্ত তাপস প্রবর আন্তরিকতার সাথে এক ধ্যানে নামায আদায় করে থাকেন।

এতে তাঁর অন্তঃজ্যোতি আরও বৃদ্ধি পায়। বস্তৃতঃ পক্ষে তখন উক্ত নামায মেরাজ হিসাবে গণ্য হয়। যখন কোন তাপস আত্ম বিবর্জিত ভাবে প্রভুর উপাসনায় মগ্ন হয়, তখন অনুভূত হয় যেন কয়েক বাটি অনল সূধা একত্রে পান করতেছে। উক্ত অনল সূধা পান করতে করতে তাঁর পিপাসার তৃপ্তি ঘটে, অন্তরে প্রশান্তি নেমে

আসে। উক্ত অবস্থায় শান্তিও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আরাম কষ্টকাকীর্ণ হয়। কেননা যদি খোদার নৈকট্য হতে বিচ্যুতি ঘটে সেই ভয়ে।

### ৩য় লিপি

নিকটতম শিষ্য, আল্লাহর নৈকট্যবান তাপস, খোদাভীরু আমার প্রিয় ভাই খাজা কুতুবুদ্দীন বখতেয়ার কাকী (রঃ), আল্লাহ্ ইহ ও পরজগতে আপনাকে শান্তিতে রাখুক।

সালাম ও দোয়ার পর, এ পত্রখানা লেখার মূল উদ্দেশ্য হলো যে, একদা এ অধম, খাজা নজমুদ্দিন সাগরা (রঃ) এবং খাজা মুহাম্মদ তারেক (রঃ) হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ) এর খেদমতে উপস্থিত থাকাকালীন অবস্থায় একজন আগন্তুক উপস্থিত হয়ে হযরতের নিকট জ্ঞাত হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে যে, কি ভাবে আল্লাহর নৈকট্যবান ব্যক্তিবর্গের পরিচয় পাওয়া সম্ভব? হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) তদুত্তরে বলেন, নেক আমল করার প্রেরণাই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। দৃঢ় আস্থা রাখা দরকার যে, খোদা কোন ব্যক্তিকে সৎকর্ম করার প্রেরণা দান করার অর্থ হলো, সে খোদার নৈকট্য লাভ করেছে।

তৎপ্রসঙ্গে একটি কাহিনী বর্ণনা করে তিনি বলেন, কোন এক সময়ে একজন লোকের এক ক্রীতদাসী অর্ধ রাত্রিতে জাগরিত হয়ে দু রাকাআত নামায আদায় পূর্বক খোদার দরবারে প্রার্থনা করতো, “হে খোদা! আমি তোমার নৈকট্য লাভ করেছি, অতএব আমাকে আর দূরে সরিয়ে রাখিও না।” একদিন উক্ত ক্রীতদাসীর এ প্রার্থনা শ্রবণ করে তার মালিক জিজ্ঞেস করলেন “তুমি কিরূপে বুঝতে সক্ষম হয়েছ যে, খোদার নৈকট্য লাভ করেছে? ক্রীতদাসী বলল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস; আমি খোদার নৈকট্যলাভে সমর্থ হয়েছি। কেননা প্রভু অর্ধরাতে জাগিয়ে দু রাকাআত নামায আদায় করবার সুযোগ আমাকে দান করেছেন।

উপরোক্ত জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে মালিক তাকে সম্পূর্ণ ভাবে আজাদ করে দেন। তাই মানবকুলের কর্তব্য দিবারাত্র আল্লাহর উপাসনায় মগ্ন থাকা। যাতে তাদের নাম আল্লাহর নৈকট্যবান ব্যক্তিবর্গের তালিকাভুক্ত থাকে এবং ইবলিস ও কুপ্রবৃত্তির নাগপাশে আবদ্ধ না হয়।

### ৪র্থ লিপি

আল্লাহর প্রতি উৎসর্গিত এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিজ্ঞ প্রিয় ভাই

কুতুবুদ্দীন (রঃ), আল্লাহ আপনার মর্তবা আরও বৃদ্ধি করুক।

বিধাতার কাঙ্গাল মঈনুদ্দীন সঞ্জরীর নিকট হতে আন্তরিক ও নিষ্কলুষ সালাম গ্রহণ করবেন। আশা করি ভাল আছেন। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘায়ু এবং নেকী দান করুক।

ভাই! আমার পীর ও মোর্শেদ হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ) ফরমায়েছেন, আধ্যাত্মিক জগতের ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত ঐশী প্রেমের বিশ্লেষণ অপর কারও নিকট প্রকাশ না করাই শ্রেয়।

একদা শেখ সাদী ময়গবী (রঃ), হজরত হারুনী (রঃ) এর নিকট হতে আধ্যাত্মিক জগতের ব্যক্তি পরিচয় সম্বন্ধে জ্ঞাত হবার আশ্রয় প্রকাশ করলে হারুনী (রঃ) বলেন, মোহমুজ্জিই উজ্জল নিদর্শন। দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করা দরকার, যে ব্যক্তির মধ্যে ত্যাগের মনোবৃত্তি আছে, সেই ব্যক্তি খোদার পরিচয় লাভ করেছে।

যার অন্তরে ত্যাগের মনোবৃত্তি নাই, ওর নিকট আল্লাহর নৈকট্যলাভের গন্ধের লেশ মাত্রও নাই। মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখা দরকার যে, “কলেমায়ে শাহাদত” এবং “নফী আস্বাত” আল্লাহতাআলার মারেফত। আসবাব পত্র এবং পদবী ভয়ঙ্কর “বুত”। উক্ত বস্তুদ্বয় বিপুল সংখ্যক মানবকে বিপদগামী করেছে এবং করতেছে।

উপরোক্ত বস্তুসমূহ ধরাতলে প্রভুর আসন নিয়ে অবস্থান করতেছে বিধায় বহুসংখ্যক ব্যক্তি জান এবং মালের পূজায় ব্যস্ত রয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে চাই যে, উক্ত বস্তু সমূহের মোহমুজ্জি যার অন্তরে স্থান পেয়েছে, সে বা তারা সফলকাম হয়েছে, খোদার নৈকট্যলাভকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গণ্য হয়েছে।

উক্ত ভাবের উদয় হয় কেবলমাত্র  $\text{لا اله الا الله}$  পাঠ করা এবং আমল করার মাধ্যমে।

সার সংক্ষেপে বলা যায়, যে ব্যক্তি কলেমায়ে শাহাদাতের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয় নাই, সে ব্যক্তি বিধাতার পরিচয় লাভে অক্ষম।

### ৫ম লিপি

সত্যপথ প্রদর্শক, খোদা প্রেমিক, আমার ভাই কুতুবুদ্দীন দেহলভী (রঃ), স্রষ্টার শান্তিময় ছায়াতলে অবস্থান করে সফলকাম হও।

একদা হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) এর দরবারে এ অধমের উপস্থিত অবস্থায় একজন আগন্তুক হাজির হয়ে বলল, হুজুর বহু ধরণের বিদ্যার্জন করেছি এবং সাধনাও করেছি কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে সমর্থ হই নাই।

উক্ত ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণের পরে হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) বললেন, তোমার জন্য একটি আমলই যথেষ্ট, যা দ্বারা বিদ্যার্জন এবং সাধনায় সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে। হুজুর পাক (দঃ) ফরমিয়েছেন যে, تَزَكُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ عِبَادَةٍ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ অর্থাৎ দুনিয়ার মোহ পরিত্যাগ করাই সমুদয় উপাসনার মূল বিশেষ এবং দুনিয়ার মহব্বত সমুদয় অনর্থের মূল বিশেষ।

তুমি যদি উপরোক্ত হাদীস শরীফটি আমল করতে সক্ষম হও, অন্য কোন রকমের এবাদত প্রয়োজন হবে না। বিদ্যা অর্জন করা সহজ কিন্তু আমল করা দুরূহ বা কঠিন। ত্যাগী হওয়া তখনই সম্ভব, যখন খোদার প্রেমের নৈকট্য লাভ করা যায়। অপর দিকে খোদার প্রেমিক হওয়া তখনই সম্ভব, যখন খোদা হেদায়াৎ করে। খোদার আশীর্বাদ ব্যতীত মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় না।

কেবল মাত্র খোদার হুকুমেই মানুষ সত্যের সন্ধান লাভে সমর্থ হয়। অন্যথায় অসম্ভব। কাজেই মানুষের উচিত সর্বক্ষণ আল্লাহকে হাজে র-নাজের জ্ঞান করে মূল্যবান সময়কে দুনিয়াবী মনস্কামনা পূরণার্থে ব্যয় না করে সময়ের সদ্যবহার করে দরবেশী ও রাজাদারের মত কালযাপন করতে অভ্যস্ত হওয়া। কাকুতি-মিনতি সহকারে স্বীয় পাপ মোচনের জন্য খোদার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করা এবং লজ্জায় আকাশের দিকে না তাকানো, সর্বাবস্থায় বিনয় এবং নম্রতা প্রকাশ করা। কেন না উক্ত বিষয়াবলীর দ্বারা সাধনায় খুব শ্রীঘ্রই ফলোদয় হয়।

অতঃপর সামঞ্জস্যপূর্ণ নিম্নোক্ত কাহিনীটির অবতারণা করে তিনি বলেন-

হযরত হাতেম আসম (রঃ), হযরত খাজা শফীক বলখী (রঃ) এর অন্যতম মুরীদ ছিলেন। একদা শফীক বলখী (রঃ) স্বীয় মুরীদকে জি

জেস করলেন, হে হাতেম আসম, কতদিন অবধি তুমি আমার অনুরক্ত হিসেবে নিয়োজিত আছ এবং উক্ত সময়ের মধ্যে কোন্ কোন্ উপদেশগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছে?

তদুত্তরে হযরত হাতেম আসম বললেন, হযরত, আনুমানিক ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত আপনার সেবায় নিয়োজিত আছি এবং উক্ত সময়ের মধ্যে “আটটি” অমূল্য শিক্ষা লাভ করেছি।

হযরত শফীক বলখী (রঃ) বলেন, উক্ত বিষয় সমূহ কি তুমি পূর্বে অবগত ছিলে না? উক্ত বিষয়াবলী ব্যাখ্যা কর।

হাতেম (রঃ) তদুত্তরে বললেন, না জনাব, উক্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে আমি অবগত ছিলাম না। বস্তুতঃ পক্ষে উহার অধিক আমার আভিলাষও নয়। শেখ বলখী (রঃ) বলেন, “ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজে উন” জীবনের অধিক সময় আমি তোমার পশ্চাতে ব্যয় করেছি। আমিও অভিলাষী না যে, তুমি এর অধিক জ্ঞাত হও।

হাতেম (রঃ) বললেন, এইটুকু জ্ঞান আমার জন্য যথেষ্ট কেননা ইহ ও পরজগতের সর্ববিধ কল্যাণ, উক্ত বিষয়াবলিতে নিহিত রয়েছে।

পীর সাহেব আদেশ করলেন উহার ব্যাখ্যা দান কর।

অতঃপর হাতেম (রঃ) ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করে বলেন, আমি যখন অন্তঃসৃষ্টিতে স্রষ্টার সৃষ্টিকে নিরীক্ষণ করি, তখন উপলব্ধি করি যে পৃথিবীর মধ্যে মানুষ কোন না কোন বস্তুকে আপন হিসেবে আঁকড়িয়ে রয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে অনুরূপ প্রেম ক্ষণস্থায়ী কেননা কিছু সংখ্যক প্রেমাস্পদ মৃত্যুর পরে কবর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। উহার পরে তাদের কোলাকুলি স্তব্ধ হয়ে যায়। মৃত ব্যক্তির সহগামী হয়ে কবরের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে, হর্ষ ও বিষাদের অংশীদার হয় না। তা হৃদয়ঙ্গম করার পর, আমি ঐ প্রভুকে প্রেমিক হিসেবে গণ্য করে নিয়েছি, যার মাগফেরাত ব্যতীত কবরের গ্লানি এবং শেষ বিচারের দিনে পরিদ্রাণ

পাওয়ার কোন পন্থা নাই। আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যে, তাকে পেতে হলে কেবলমাত্র নেক আমল দ্বারাই সম্ভব।

খাজা শফীক বলখী বলেন, হাতেম, খুব ভাল আমল করেছে। এর পরে হাতেম (রঃ) বলেন।

**দ্বিতীয়তঃ** আমি যখন লোক-জনের স্বভাব চরিত্রের দিকে লক্ষ্য করি, তখন বুঝতে পারি যে, প্রায় লোক স্বীয় রিপূর তাড়নায় অস্থির এবং আকাঙ্ক্ষার বশীভূত হয়ে জীবনযাপন করতেছে।

আমি তখন কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত শরীফের প্রতি মনযোগী হলাম,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَيَٰ أَلْحَقْنَا بِهِ أَجْرًا مِّمَّا يَكْتَسِبُ  
 (অর্থাৎ যে ব্যক্তি খোদার ভয়ে স্বীয় রিপূর সহিত বিদ্রোহ ঘোষণা

করেছে, তার গন্তব্যস্থল বেহেশত তখন আমি দৃঢ়ভাবে খোদার কালাম পাকের উপর আস্থা স্থাপন করে, স্বীয় রিপূর সাথে যুদ্ধ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে অসীম সাহসের সাথে আল্লাহর উপাসনার বেড়া জালে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছি। নফসের মনোমত সমস্ত কার্য হতে বিরত রয়েছে। কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে সুখ ও স্বাস্থ্যের মধ্যে কালান্তিপাত করতেছি।

খাজা শফীক বলখী (রঃ) বললেন, আল্লাহ তোমার আমল বৃদ্ধি করুক। তুমি যা কিছু করেছ খুব ভাল করেছে।

**তৃতীয়তঃ** মনোযোগের সহিত যখন আমি মানবকুলের জীবনযাপনের প্রতি লক্ষ্য করি, তখন অনুভব করতে পারলাম যে প্রায় লোক পার্থিব লোভ লালসা এবং আধিপত্যের মোহে অভাবনীয় দুঃখ, ক্লেশ সহ্য করতেছে এবং উক্ত সফলতায় তারা পুলকিত। অনুরূপ ক্রিয়া কলাপ লক্ষ্য করে, আমি কালামপাকের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি মনোযোগী হলাম, مَا عِنْدَكُمْ يَنْفِضُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ (অর্থাৎ যাহা কিছু তোমার

নিকট গচ্ছিত আছে তা বিলীন হয়ে যাবে। আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে তা চিরস্থায়ী। তাই আমার যা কিছু গচ্ছিত ধন সম্পদ ছিল, তা আল্লাহর পথে আকাতরে বিলায়ে দিয়েছি। যাতে আমার উক্ত ধন সম্পদ আল্লাহর ধন-ভাণ্ডারে গচ্ছিত থাকে এবং শেষ বিচার দিবসে যাতে উক্ত ধন সম্পদ আমার পরিদ্রাণে সাহায্যকারী হয়।

খাজা শফীক বলখী (রঃ) বললেন, খোদা তোমাকে আরও অধিক নেক আমল করার তৌফিক দান করুক, তুমি খুব ভাল আমল করেছে।

**চতুর্থতঃ**- আমি যখন লোকজনের ক্রিয়াকলাপের প্রতি গভীর ভাবে লক্ষ্য করি তখন দেখি যে, কিছুসংখ্যক ব্যক্তিবর্গ এবাদত বন্দেগীতে সর্বস্ব ধারণ করে গর্বিত, অপরদিকে কিছু লোক ধন সম্পদ ও সম্ভান সম্ভতির গৌরবে গৌরবান্বিত, তখন আমি কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত শরীফের ভাবার্থের প্রতি মনোযোগী হই,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহর নিকটতম, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল)। কুরআন পাকের বাণীই সত্য। জনগণ যে সমস্ত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উহার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, তা ভুল।

তাই আমি খোদার প্রতি তাওয়াক্কুল করাকে আমার চরম ও পরম কর্তব্য মনে করেছি, যাতে খোদার নৈকট্যলাভ সহজতর হয়।

খাজা শফীক বলখী (রঃ) বললেন, হাতেম, তুমি খুব ভাল কাজ করেছে।

**পঞ্চমতঃ** আমি যখন মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য করি, তখন প্রত্যক্ষ করি যে, মানুষ হিংসার বশবর্তী হয়ে একে অপরের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত রয়েছে। আবার উক্ত হিংসা কেবল মাত্র ধন সম্পদ, সামাজিক অবস্থান এবং জ্ঞান গরিমাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত। তখন আমি কুরআন করিমের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হলাম

نَحْنُ قَسَمًا نَبَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا

(অর্থাৎ আমিই তাদের প্রার্থিব জগৎ দান করেছি। এবং জীবনধারণের জন্য খোরপোষ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছি। আমি বুঝতে পারলাম যে, প্রভু যখন সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, খোদা ব্যতীত কিছু দান করার, কিংবা বধিগত করার সামর্থ্য যখন অপর কারো নাই তখন হিংসা বিদ্বেষ অনর্থক বৈকি।

উপরোক্ত বাক্য হৃদয়ঙ্গম করার পর হতে হিংসা, বিদ্বেষ এবং পরশীকারতা ইত্যাদি ত্যাগ করে সকলের সহিত সখ্যতা স্থাপনের পস্থা অবলম্বন করেছি। হযরত শফীক বলখী (রঃ) বললেন, হাতেম, তুমি কাজের মত কাজ করেছ।

ষষ্ঠতঃ- আমি লোকজনের প্রতি নিরীক্ষণ করে অনুভব করতে সক্ষম হই যে, একে অপরের সাথে অনর্থক শত্রুতা করতেছে, অপর দিকে বন্ধুত্বও করতেছে। ওটাও কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। তখন আমি কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের ভাবার্থ উদ্ধারে রত হলাম وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (অর্থাৎ শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু)। আমার হৃদয়ঙ্গম করতে বিলম্ব হল না যে, প্রকৃতপক্ষে শয়তান আমাদের চির শত্রু। খোদার কালাম হক। হযরত শফীক বলখী (রঃ) বললেন, হাতেম সত্যিই তুমি নেক আমল করতে সক্ষম হয়েছ।

সপ্তমতঃ- হাতেম (রঃ) পুনরায় বলেন, সর্বসাধারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে লক্ষ্য করি যে, লোকজন জীবিকা অন্বেষণে বৈধ-অবৈধতার বিবেচনা না করে অর্থ উপার্জনে লিপ্ত রয়েছে। অধিকন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয় প্রতিপন্ন এবং লাঞ্চিত হচ্ছে। অতঃপর পাক কালামের নিম্নোক্ত আয়াত পড়ে وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (অর্থাৎ সৃষ্টির সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন প্রাণী নাই, যার খোর-পোষের দায়িত্ব আল্লাহ বহন করতেছে না) আমার বোধগম্য হল যে, আমিও একটি প্রাণী বিশেষ। সুতরাং আমি রিজিকের পশ্চাতে ধাবিত না হয়ে কায়মনোবাক্যে

সর্বক্ষণ আল্লাহর উপসনায় মগ্ন থাকাকে শ্রেষ্ঠ পস্থা হিসেবে পরিগণিত করেছি। প্রয়োজনানুসারে রিজিকের সংস্থান করার দায়িত্ব আল্লাহর। খাজা শফীক বলখী (রঃ) বললেন, হাতেম তোমার, আমল অতুলনীয়।

অষ্টমতঃ- হাতেম (রঃ) বলেন, যখন আমি লোকজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন প্রত্যক্ষ করি যে, প্রায় লোক স্বর্ণ এবং রৌপ্যকে, আবার অনেকেই রাষ্ট্র শক্তি কিংবা অর্থকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমি তখন কালাম পাকের নিম্নোক্ত আয়াত শরীফের প্রতি আকৃষ্ট হলাম وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভরশীল হয়ে কালাতিপাত করতেছে, যেটা তার জন্য যথেষ্ট)।

খাজা শফীক বলখী (রঃ) বললেন হাতেম, দোয়া করতেছি খোদা তোমাকে উপরোক্ত বিষয় সমূহে আমল করার মনোবল অক্ষুন্ন রাখুক।

তিনি আরও বলেন, তৌরাত, ইঞ্জীল, জবুর এবং কুরআন পাক, উক্ত ৪ খানা মহাগ্রন্থ পাঠান্তে -আমিও উক্ত বিষয় সমূহ পেয়েছি। যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ উক্ত বিষয়াবলী আমল করে সে বস্তৃতঃ পক্ষে উপরে উল্লেখিত চারি খানা মহাগ্রন্থকে অনুসরণ করে চলে।

অতঃপর খাজা শফীক বলখী (রঃ) বলেন, হাতেম, উপরোক্ত বাক্যালাপের পরে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তোমার আর অতিরিক্ত বিদ্যার প্রয়োজন নাই। শুধুমাত্র উপরোক্ত বিষয়াবলী হৃদয়তার সাথে পালন করাই বাঞ্ছনীয়।

## ৬ষ্ঠ লিপি

খোদা ভীরু, আল্লাহর করুণায় ধন্য আমার ভাই খাজা কুতুবুদ্দীন, আল্লাহ আপনাকে কুশলে রাখুক।

একদা আমার শেখ 'نُفَى' (নফী) এবং 'أَثْبَات' (এসবাত) "স্বপ্নে আলোচনার মধ্যে দিয়ে অনেক বক্তব্য পেশ করেন। যেমন- "نُفَى"

(নফী) ” নিজের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া ।

“ اثبات (এসবাত) ” আল্লাহুতালার কুদরতের প্রতি গভীর ভাবে লক্ষ্য করা । খোদার কারিগরী হতে কোন সৃষ্টি বিচ্ছিন্ন নয় । সেহেতু সবার উচিত ওয়াহেদীয়াতের গুণগান করা । বিনিময়ে কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা করা অবাঞ্ছনীয় । অন্যথা সমস্ত কিছু বৃথায় পর্যবসিত হবে । “ نفى (নফী) ” হবে মূল্যহীন ।

যদি নিম্নলিখিত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয় যে, স্বীয় অস্তিত্ব কেবলমাত্র আল্লাহর তরে এবং আল্লাহুতাআলার অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ, তা হলে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব হবে ।

এখন কথা হল যে, কলেমায়ে শাহাদত, নামায, রোযা ইত্যাদির নিয়মাবলী এবং গুঢ় রহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞ রয়ে বা সঠিক ভাবে আদায় না করে বাহ্যিক ভাবে উহা সম্পন্ন করা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয় । যে সমস্ত ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয়াবলীর মর্মার্থ এবং প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী হতে অজ্ঞ, তারা বড়ই দুর্ভাগা । আল্লাহ জল্লাশানুহু সর্বকালে বিরাজমান ছিল, আছে এবং থাকবে । আরেফীন সূচনাতে মনঃচক্ষুবিহীন অবস্থায় থাকে । যখন রব্বুল আলামীন হতে নূর প্রাপ্ত হয়, তখন দিব্য চক্ষে সমস্ত কিছু নিরীক্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং স্বীয় অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয় । উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া, বস্তুরপক্ষে পরকালের জীবন প্রাপ্ত হওয়া ।

আচ্ছালামু আলাইকুম- মঈনুদ্দীন ।

## ৭ম লিপি

আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিজ্ঞ, করুণাময়ের প্রতি অটল আস্থাবান আল্লাহর প্রেমিক ভাই কুতুবুদ্দীন (রঃ), আল্লাহু আপনার জ্ঞান গরিমাকে আরও বৃদ্ধি করুক । অধমের সালামের পরে যৎসামান্য মারেফতের বর্ণনা

লিপিবদ্ধ করতে মনস্থ করেছি ।

প্রিয়তম, অবশ্যই মুরীদানগণকে অবহিত করবেন যে, মোর্শেদে কামেল কাহাকে বলে? তাদের পরিচয় কি? কিরূপে তাদের চিনতে পারা যায়?

আমার মোর্শেদ বুজুর্গ একদা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, দরবেশ ঐ ধরণের ব্যক্তিকে বলা হয়, যার প্রয়োজন বলতে কিছুই নাই । কেবলমাত্র পর-জগতের সম্পদ আহরণই মুখ্য উদ্দেশ্য । কেননা ইহ জগতের সমস্ত কিছু পরজগতের প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কিছুই নয় । সেহেতু দরবেশগণ অভিস্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ইহ জগতকে নিরীক্ষা করে ।

অনেক মহাত্মাগণ বলেছেন, তাপস ওকে বলা শোভা পায়, যার অন্তরে খোদার অস্তিত্ব ব্যতীত অপর কোনরূপ বস্তুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না । আল্লাহর নৈকট্য লাভ ব্যতীত অন্য কোনরূপ কামনা কিংবা বাসনা নাই ।

সুতরাং অভিস্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে হলে অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করবে । ওটাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যাহাই মনে কর না কেন, কিন্তু সর্বাঙ্গে এবং সর্বত্র শরীয়তের প্রাধান্য বিদ্যমান এবং অলঙ্ঘণীয় ।

আচ্ছালামু আলাইকুম

মঈনুদ্দীন ।

## ৮ম লিপি

প্রাণাধিক বিশ্বস্ত আমার ভাই খাজা কুতুবুদ্দীন (রঃ), আল্লাহ আপনার সমুদয় কর্মে সহায়তা দান করুক । বর্ণিত আছে যে,

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَقُولُ اللَّهُ وَمَنْ يَقُولُ اللَّهُ مَا عَرَفَ اللَّهَ

(অর্থাৎ- আরেফ চলাফেরা অবস্থায় আল্লাহ আল্লাহ করে না বরং যে চলমান অবস্থায় আল্লাহ আল্লাহ করে সে আরেফ হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে নাই)। বরঞ্চ যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে, সে বোবা এবং খোঁড়া হয়ে গিয়েছে। প্রকৃত তাপসের স্মরণশক্তিও লুপ্ত হয়ে যায়। কেননা প্রকৃত তাপসের দৃষ্টিতে স্মরণশক্তিও এক প্রকার রিপু।

আল্লাহতাআলা এরশাদ করেছে-

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(অর্থাৎ- আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তিবর্গের কোন ভয় ভীতি থাকে না)।

আল্লাহতাআলা মানুষের অন্তরে এবং অন্তর হৃদয়ে অবস্থিত। আবার আত্মা দুই প্রকার। যথাঃ পবিত্র আত্মা ও পরম আত্মা। পবিত্র আত্মা উত্তরেও নয় দক্ষিণেও নয়, উর্ধ্বে কিংবা অধেও নয়, দূরে এবং নিকটেও নয়। অনুরূপ পবিত্র আত্মার পরিচয় পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। কেবলমাত্র খোদার নৈকট্যবান ব্যক্তিগণই এর সম্যক পরিচয় লাভ করতে সক্ষম।

প্রকৃত প্রস্তাবে মোমেনগণের হৃদয় আল্লাহতাআলার আরশ। আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা ব্যতীত মহামনীষী বা ওলীয়ে কামেল পরিগণিত হওয়া অকল্পনীয়। প্রকৃত সাধক ও সরল অন্তরের অধিকারী মুরীদ কস্মিনকালেও স্বীয় পীরের সাথে প্রশ্ন উত্তরের অবতারণা করে না বরং শ্রদ্ধার সাথে নিশ্চুপভাবে বসে থাকে। প্রকৃত দরবেশের অন্তরে সব সময় অন্তঃজিকির জারী থাকে। কেননা সে পুণ্যাত্মা প্রাপ্ত হয়েছে। যেহেতু সাধারণ মুসলমানগণ জিকিরে খফী হতে অবহেলিত, সেহেতু তারা জীবনুত প্রায়। খোদার প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ **أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ** (লাইলাহা ইল্লাহ) বলে থাকে সত্য, কিন্তু অস্তিত্ব এবং বিলীন সম্বন্ধে সম্যক কোনরূপ জ্ঞান তাদের নেই, তারা **نفى** (নফি) এবং **اثبات**

(এছবাত) কাকে বলে জানে না। কলেমার প্রকৃত অর্থ হল অংশীদারবিহীন এবং খোদার অস্তিত্ব ব্যতীত পৃথিবীতে অপর কারও অস্তিত্ব নাই এবং মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) তার প্রেরিত পুরুষ।

মুরীদানগণের অন্তরে কস্মিনকালেও অপর কারও অস্তিত্বের ধারণা না আসাই উচিত। সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় খোদার অস্তিত্ব অনুভব করতে হবে। এর স্বপক্ষে স্বয়ং আল্লাহতাআলা ফরমায়েছেন “যেদিকে দৃষ্টিপাত করবে, আমার অস্তিত্ব অনুভূত হবে”।

নামায দুই প্রকার যথাঃ- (১) আলেম, ফকির ও সাধকগণের নামায।

(২) আশ্বীয়া, আওলীয়া এবং খলিফাগণের নামায।

সাধারণ নিয়ম কানুনের সীমাবদ্ধ নামায আদায়ের দ্বারা খোদার নৈকট্যলাভ করা যায় না। উহা আলমে মালাকুতে নফসানী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

২য় প্রকার নামায আশ্বীয়া, আওলীয়া ও খলিফাগণের নামায যা হুজুরী ক্বলবের সাথে আদায় করা হয়। উহা আল্লাহর নৈকট্যলাভে সাহায্য করে। এর ব্যাপ্তি “আলমে জবরুতে রহমানী” পর্যন্ত। উপরন্তু হাদীস শরীফে আছে “আশ্বীয়া, আউলীয়া এবং খলীফাগণ সব সময় হুজুরী ক্বলবের সাথে নামায আদায় করে থাকেন।”

হাদীস শরীফে আরও উল্লেখ আছে যে, “আশ্বীয়া এবং ওলী আল্লাহগণের অন্তরে সব সময় জিকিরে খফী **خَفِي**” জারী থাকে।

কেননা মোখিক জিকির হল সম্পর্ক স্থাপনকারী, অন্তঃজিকির একপ্রকার অনুভূতি। রুহানী জিকির আল্লাহর নৈকট্যলাভের সাধনা এবং জিকিরে খফী **خَفِي** সব সময় চালু থাকা।

জিকিরে খফী **خَفِي** এবং হুজুরী ক্বলবের নামায স্বীয় অস্তিত্ব বিলীনকারী।

প্রকৃত রোযার বর্ণনা নিম্নরূপঃ রোযা আদাকারীর ইহ কিংবা পরজ

গতের প্রতিদান প্রাপ্তির জন্য লালায়িত রিপুকে কঠোর হস্তে দমন পূর্বক রোযা রাখা বেহেশত লাভের আকাঙ্ক্ষায় কিংবা আল্লাহ ব্যতীত অপর কোন বস্তুর মোহ রোযার ক্ষতিসাধন করে। তাই হুজুর (দঃ) ফরমায়েছেন “আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও প্রেমের প্রত্যাশী নই।”

হুজুর (দঃ) আরও ফরমায়েছেন “রোযা খোদার নৈকট্যলাভের প্রথম সোপান এবং ইফতার অনন্ত কেয়ামতের দিবসে আল্লাহর নৈকট্যলাভের অনুরূপ।

হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে রোযাদারগণের নিমিত্তে দুইটি সুখবর দেওয়া আছে। যথাঃ- ইফতারের সময় বা রোযা খোলার সময় এবং খোদার সাথে সাক্ষাতের সময়।

সর্বসাধারণের জন্য প্রথমে রোযা পরে ইফতার। কিন্তু প্রকৃত রোযার নিয়ম হল প্রথমে ইফতার পরে রোযা। প্রকৃত রোযার জন্য ইফতার কোন শর্ত নয়, বরঞ্চ ইফতারের জন্য রোযা শর্ত।

সর্বসাধারণ যে রোযা রাখে এতে পানাহারাদি ত্যাগ করে সত্য, কিন্তু সেটা ঐশ্বরিক নয় বরং বাহ্যিক। উক্ত রোযার মধ্যে প্রায় একত্ববাদের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে রিপূর এবং ইহজাগতিকতার অস্তিত্ব থাকবার সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের রোযার মধ্যে ক্ষুধা পিপাসার অনুভূতি জন্মে। উক্ত রোযার দ্বারা লাভ হলো ক্ষুধা পিপাসার কাতরতা উপলব্ধি করা যায় এবং ক্ষুধা পিপাসার্তদের সাহায্য করার মনোবৃত্তি জন্মে। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, “আমার ওলীগণের স্থান আমার কাযার নিম্নে এবং তাদের মর্তবা আমি ব্যতীত অপর কারও পক্ষে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়”।

উম্মাদ নয় এমন অনুসারীগণ কামেল পীরের সাহায্য ব্যতীত এবং সংশোধন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র “আলমে জব্বরুত” পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। তারা আলমে নাসূন এবং আলমে মালাকুত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তারা রিপূর তাড়নায় তাড়িত।

যে সমস্ত আলেম, ফকির দরবেশ “মজ্জুব” নয় এবং কোন কামেল পীরের

নিকট হতেও দীক্ষা গ্রহণ করে নাই, তারা খোদার কুদ্রতের ব্যাপারে অজ্ঞ। তারা দরবেশ হিসেবে গণ্য হয় সত্য, কিন্তু তাঁরা অদৃশ্যভাবে ভোগলালসার বশীভূত এবং রিপূর জিজিরে আবদ্ধ। ঐ সমস্ত দরবেশ বোধধারীগণের মূল উদ্দেশ্য খোদার পায়রবি নয়, বরঞ্চ তারা ধন সম্পদের দিকে ধাবিত। তাদের কলেমা, রোযা এবং নামাযের কীহবা মূল্য থাকতে পারে।

যে সমস্ত লোক দরবেশগণের দলভুক্ত হয়, তাদের উচিত স্বীয় অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয়া। যদি তা করতে অক্ষম হয়, তা হলে, তাদের উচিত সুফীগণের দলভুক্ত হওয়া। কিন্তু সে কখনও আরেফ শ্রেণীভুক্ত হতে সক্ষম হবে না। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী একশত দিনারের জন্য আড়াই দিনার যাকাত আদায় করা ফরয। কিন্তু পূর্ববর্তী বুজুর্গ ব্যক্তিগণ শত দিনার হইতে ২১০ দিনার স্বীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রেখে অবশিষ্ট অংশ যাকাত হিসেবে বন্টন করাকে অবশ্য করণীয় বলে মনে করত।

যাকাত স্বাধীন ব্যক্তির জন্য ফরজ। কিন্তু ক্রীতদাসের জন্য যাকাত ফরজ নয়। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত রিপূর তোষণ হতে মুক্ত হতে পারে নাই ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন লোক হিসেবে গণ্য হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যাকাত আদায় করা আবশ্যকীয় নয়। মানবের উচিত সর্বাত্মে স্বীয় রিপূর বশ্যতা হতে মুক্ত হওয়া, যাতে প্রকৃত যাকাত আদায়কারীগণের অন্তভুক্ত হওয়া যায়। যাকাত প্রাপ্তবয়স্ক লোকের অবশ্য দেয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং উন্মাদের জন্য যাকাত আদায় করা বিধি বহির্ভূত। বস্তুতঃ পক্ষে যে সমস্ত লোক অবহেলা করে এবং রিপূর বশীভূত থাকে, আল্লাহতাআলার নৈকট্যলাভকারী ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

সুতরাং মানবের উচিত প্রকৃত যাকাত আদায় করার জন্যে, উপযুক্ততা অর্জনের জন্য স্বীয় রিপূর বশ্যতা হতে মুক্ত হওয়া। আল্লাহর ভাগুর অফুরন্ত, আরেফগণের হৃদয় আল্লাহর সম্পদ। আরেফগণের উচিত তাদের অফুরন্ত ভান্ডার হতে অবহেলিত এবং লোভীগণকে পরম

করণাময়ের যাকাত হিসেবে যৎসামান্য দান করা। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে- নবী করিম (দঃ) ফরমায়েছেন যে, قَلْبُ الْإِنْسَانِ بَيْتُ الرَّحْمَنِ (অর্থাৎ- মানুষের অন্তর খোদার ঘর)। অপর একটি হাদীসে হুজুর (দঃ) ফরমায়েছেন যে, قَلْبُ الْمُؤْمِنِينَ عَرْشُ اللَّهِ تَعَالَى (অর্থাৎ মোমেনগণের হৃদয় আল্লাহর আরশ) মানবের অস্তিত্ব চতুর্দিকে চর্ম প্রাচীর বেষ্টিত একটি প্রাণী বিশেষ।

কিন্তু মানুষের অন্তর হতে যখন সন্দেহ অবিশ্বাস এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্তির পর্দা বিদূরিত হয় তখন হৃদয়ের আঙ্গিনায় খোদার উজ্বল জ্যোতির প্রবেশ ঘটে। উক্ত হৃদয় তখন হজ্জের কাবার জন্য ব্যাকুল হয়। প্রকৃত হজ্জের অর্থ হল, মানবের স্বীয় অস্তিত্বকে বিলীন করে দিয়ে দৃশ্য এবং অদৃশ্য বিষয়াবলী হতে কলুষমুক্ত অবস্থায় আপন হৃদয়কে খোদার প্রতি সপে দেয়া।

খোদার নৈকট্যলাভ কেবলমাত্র নির্মল প্রেমের দ্বারা হাসেল করা সম্ভব। যে ব্যক্তি খোদার প্রেমে বিভোর হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, সে ব্যক্তি ঐশী প্রেমিকের গৌরবে গৌরবান্বিত।

আল্লাহতাআলা ফরমায়েছেন وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (অর্থাৎ হে লোক সকল, আমি তোমাদের মধ্যে বিরাজমান। তোমরা কেন আমাকে দেখিতে পাও না?)

এ জন্যই মানুষের অন্তরকে আল্লাহর আরশ এবং আল্লাহর ঘর বলা হয়ে থাকে।

পয়গম্বরগণের উদাহরণ চিকিৎসকগণের অনুরূপ। যেভাবে চিকিৎসকগণ বিভিন্ন প্রকার রোগ নির্ণয় করে থাকে, অনুরূপ ভাবে পয়গম্বরগণও অন্তরকে সংশোধিত করার জন্য আধ্যাত্মিক রোগ সমূহের ঔষুধ প্রয়োগ করতেন, মারফত দান করতেন, যাতে রুহানী রুগীগণ সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ হয়ে খোদার নৈকট্যবান

ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিগণিত হতে পারে। মানুষের প্রথম শ্রেণী দুনিয়াদার তাদেরকে (আরবাবে জাহেরী) رَبَابٌ ظَاهِرٌ বলা হয়। তারা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী চলে থাকে। আল্লাহ প্রেমের ৪ ধাপের মধ্যে প্রথম ধাপ পর্যন্ত ওদের বিচরণ। যদি উক্ত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তা হলে জাহেরী এবাদত অবস্থায় তিরোধান হল বুঝতে হবে। যদিও বা সে আলেমগণের মধ্যে উত্তম।

২য় শ্রেণীর লোক বাতেনীর দিকে মনযোগী হয় বটে, কিন্তু বাতেনী সমুদ্রের ঢেউ-এর খবরাখবর সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ। তারা কখনও দীনের প্রতি আবার কখনও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের অদৃশ্য নয়ন বাতেনী নূরে সম্পূর্ণভাবে নূরায়িত হয় না। উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে তরীকত পন্থী বলা হয়।

৩য় শ্রেণীর লোক প্রকৃত সাধক, তাদেরকে হাক্কীকতপন্থী বলা হয়।

৪র্থ শ্রেণীর লোক আল্লাহর খাঁটি বান্দাগনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে মারফত পন্থী বলা হয়।

আল্লাহর বিশেষ রহমত এবং অলৌকিক শক্তি সমূহ সাধারণ শ্রেণীর লোকদিগকে দান করে না, পৃথিবীর সমুদয় বস্তু সমূহ আল্লাহর কুদ্রতের প্রদর্শনী।

প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত কিছু একই বস্তু, যদি উহা বাহ্যিকভাবে উহাদের গুণাগুণ ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। যেমন সমস্ত কিছু একই অর্থ বোধক। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শব্দালঙ্কার দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আল্লাহতাআলা এরশাদ করছে إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّخْفَى (অর্থাৎ আল্লাহতাআলা সমুদয় বস্তু সমূহে নিহিত আছে। কিন্তু মানবকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে)

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى سُوْرَتِهِ (অর্থাৎ- আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ দঃ)কে আপন অবয়বে পয়দা করেছে এবং فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ একে অপরের উপর ফজীলত দান করছি কিন্তু এতে খোদার একত্ববাদ

বজায় রয়েছে।

## আতায়ের রসূল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর সংসার ধর্ম পালন

প্রকাশ আছে যে, খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) আজমীরে অবস্থান কালে দু'বার বিবাহ করেন। কত বৎসর বয়সকালে তিনি শাদী করেন, সেই ব্যাপারে লেখক সমাজের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন সূত্রের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ মত হল, তিনি ৭৯ বৎসর বয়সে স্বপ্নের মাধ্যমে হুয়ুর (দঃ) কর্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হয়ে প্রথমবার বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন।

অপর মতে দেখা যায় যে, তিনি ৫৮৯ হিজরী সনে প্রথমবার বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন।

যদি ৫৩৭ হিজরী সালকে খাজা সাহেবের জন্মের বছর হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে ৫৮৯ হিজরী সনে খাজা (রঃ) এর বয়স ৫২ বৎসর হয়। অপর এক মতে দেখা যায় যে, নশ্বরদেহ ত্যাগের ৪৭ বৎসর পূর্বে তিনি প্রথম বিবাহ করেন।

তাঁর পরপারে যাত্রা এবং বয়সের ব্যাপ্যারেও যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান। সেহেতু তাঁর ১ম এবং ২য় শাদীর ব্যাপারে বয়সের যোগসূত্রের দ্বার উদঘাটন করা খুবই কষ্টসাধ্য। কিন্তু এটা সর্বজনবিদিত যে, তিনি দু'বার বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর সহধর্মিনীগণের মধ্যে একজনের নাম বিবি আস্মতউল্লা এবং দ্বিতীয় জনের নাম বিবি আসাতুল্লাহ ছিল। তাঁর সহধর্মিনীদ্বয়ের মধ্যে কার সাথে অগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় সেই ব্যাপারে লেখক সমাজের মধ্যে বিভিন্ন মতের লক্ষ্য করে আমি উক্ত আলোচনা হতে বিরত রইলাম। বিবি আস্মতউল্লাহ ছিলেন তৎকালীন আজমীরের হাকীম খাজা আজীউদ্দীন মশহুদী (রঃ) এর কন্যা। তিনি গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর নিকট আত্মীয় এবং উচ্চ মর্তবার

বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন।

একদা স্বপ্নযোগে ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) আজীজ উদ্দীনকে বলেন যে, আমি “হুয়ুর (দঃ) কে দেখেছি এবং তাঁর আদেশ- তোমার সাবেরা এবং তাহেরা কন্যার সাথে মঈনুদ্দীন হাসান (রঃ) এর শুভ বিবাহ সম্পন্ন কর। তিনি অত্যন্ত আনন্দ এবং ব্যাকুলতার মধ্যে দিয়ে গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর সাথে তাঁর পুত্রপবিত্র কন্যার বিবাহ দেন।

অপরদিকে স্বপ্নযোগে গরীবে নেওয়াজ (রঃ) কে হুজুর পাক (দঃ) বলেন- “মঈনুদ্দীন তুমি আমার সুনুতের প্রতি কেন অবহেলা করতেছ?”

অপর বিবি আসাতুল্লাহ (মুসলমান হবার পরের নাম) একজন হিন্দু রাজার পরমাসুন্দরী কন্যা ছিলেন। মুসলমানগণ এক যুদ্ধে তাঁকে বন্দী করেছিলেন। খাজা সাহেব প্রথমে মুক্ত করে দেন। পরে তাঁর সম্মতিক্রমে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রবাদ আছে যে, তিনি মুসলমান হবার বহুকাল পূর্ব হতে একত্ববাদের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন।

খাজা সাহেবকে আল্লাহতায়াল্লা তিন পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান দান করেছিলেন।

সৈয়দ ফখরুদ্দীন আবুল খাইর (রঃ), সৈয়দ হেসামুদ্দীন আবু সালাহ (রঃ), সৈয়দ জিয়াউদ্দীন আবু সাইদ বিবি আস্মতউল্লার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে প্রকাশ।

ভিন্ন মতে বিবি আসাতুল্লার গর্ভে খাজা সাহেবের পুত্র সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

বিবি আসাতুল্লাহর গর্ভে একমাত্র পুত্র হাফেজ জামাল জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে নির্ভর যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

সৈয়দ ফকরুদ্দীন (রঃ) এবং হাফেজ জামালকে গরীবে নেওয়াজ (রঃ) খেলাফৎ প্রদান করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

## খাজা গরীবে নেওয়াজ ১১৩

খাজা সাহেবের পরলোক গমনের প্রায় ৩০ বৎসর পর বিধর্মীগণের সাথে এক যুদ্ধে সৈয়দ খাজা ফখরুদ্দীন (রঃ) শাহাদত বরণ করেন।

তঁার মাজার কিষাণগড়ের সরওয়াড় নামক স্থানে অবস্থিত। এর দূরত্ব আজমীর হইতে প্রায় ৪৩ মাইল।

তঁার ওরশ মোবরক প্রত্যেক চন্দ্র বছরের শাবান মাসের ৩ তারিখ হতে ৬ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সৈয়দ জিয়াউদ্দীন আবু সাইদ (রঃ) এর মাজার, খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর দরগাহের দক্ষিণ পার্শ্বে ঝাল্লারার নিকটে অবস্থিত। প্রত্যেক জিলহজ্ব মাসের ১৩ তারিখ তঁার বাৎসরিক ওরশ অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দ হেসামুদ্দীন আবু সালাহ (রঃ) এর মাজারও সৈয়দ জিয়াউদ্দীন (রঃ) এর মাজারের নিকটে অবস্থিত। বিবি হাফেজ জামাল হায়াতকালে মহিলাগণকে শরীয়ত এবং মারফতের শিক্ষা দিতেন। পরলোক গমনের পরে পিতার পাদদেশে তঁাকে সমাধিস্থ করা হয়। প্রত্যেক চন্দ্র বছরের ১৯শে রজব তঁার ফাতেহাখানী অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবাদ আছে যে, ৭২৭ হিজরী সালে ৬ই রজব মাস এশার নামাজ আদায় করে আতায়ে রসুল, খাজায়ে খাজোগান, তাপসকুল শিরমণি, গরীবে নেওয়াজ (রঃ) স্বীয় কুটিরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে এবাদতে মগ্ন হয়ে পড়েন। যখন ফজরের নামাজ আদায় করার জন্য তিনি হুজুরা হতে বের হন নাই, তখন খাদেমগণ বাহির হতে আওয়াজ দিয়েও অন্দর হতে কোন রকম সাড়া শব্দ না পাওয়াতে, বাধ্য হয়ে দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে দেখেন যে, আল্লাহর দোস্ত আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে গমন করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজে উন)।

উপস্থিত লোকজন দেখতে পেলেন যে, তঁার কপালে খোদার কৃদরতে লেখা রয়েছে اللَّهُ مَاتَ فِي حُبِّ اللَّهِ অর্থাৎ

## খাজা গরীবে নেওয়াজ ১১৪

আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর জন্যে দেহ ত্যাগ করেছেন।

তঁার সুযোগ্য প্রথম সন্তান সৈয়দ খাজা ফখরুদ্দীন নামায়ে জানাজার ইমামতী করেছিলেন বলে প্রকাশ আছে।

খাজা (রঃ) যে হুজরায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই হুজরাতেই তঁাকে সমাধিস্থ করা হয়।

বিভিন্ন মতামতে লক্ষ্য করা যায় যে, গরীবে নেওয়াজ (রঃ) সর্বমোট ৬০ হতে ৭০ জনের মত বুজুর্গ ব্যক্তিগণকে খেলাফত প্রদান করে পৃথিবীর বুকে চিশ্তীয়া তরিকার প্রথা অব্যাহত রাখেন।

## আতায়ে রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর মাজার

প্রাকৃতিক প্রাচীর বেষ্টিত উঁচু নিচু পাহাড়ের পাদদেশে খাজা সাহেবের নয়নাভিরাম মনোমুগ্ধকর মাজার শরীফটি অবস্থিত।

খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশ্তী (রঃ) মাজার শরীফের দক্ষিণে ঝাল্লারা বা প্রস্রবণ পূর্ব পার্শ্বে লঙ্গরখানা গলি এবং খাদিম মহল্লা, উত্তর পার্শ্বে সদর দরওয়াজা, দরগাহ বাজার এবং পশ্চিম দিকে ত্রিপোলিয়া গেইট হয়ে আড়াই দিনের ঝোপড়ার পার্শ্ববর্তী রাস্তা তথা অন্দর কোটের মধ্য হয়ে তারা গড় শহীদগণের রাস্তা অবস্থিত।

প্রস্তুত প্রণালী এবং স্থাপত্যের দিক দিয়ে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর মাজার শরীফ একটি অনন্য সাধারণ নিদর্শন।

উক্ত প্রখ্যাত ইমারতকে বেষ্টন করে চুতঃপার্শ্বে তঁার প্রতি নিবেদিত প্রাণ বাদশাহ, রাজা মহারাজা, নবাব আমীর ওমরাহ এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ভক্তির পরাকাষ্ঠা স্বরূপ বহু অট্টালিকা নির্মাণ করেয়েছেন।

উক্ত ভবনের বিশদ বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল। যথা- আতায়ে রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ মহফিল খানা, বারাদরী দালান, শাহজাহানী

জামে মসজিদ, সন্দলী মসজিদ, আওলীয়া মসজিদ, আকবরী মসজিদ, কলেমা গেইট, শাহী নাক্কারখানা কর্ণাটকী দালান এবং মোলখায়া মসজিদ ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধ।

## মাজার শরীফের ইতিকথা

খাজা (রঃ) এর মাজার বহুকাল অবধি কাঁচা অবস্থায় ছিল। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাঁর মাজারেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

১৩৯ হিজরী সালে সুলতান গিয়াসউদ্দীন কতুক নজর বাবদ এক বিরাট অঙ্ক দান করার পরে, তাঁর মাজারের উপর অত্যন্ত ব্যয় বহুল সুন্দর মনোমুগ্ধকর একটি গম্বুজ তৈরী করা হয়।

“আখবারুল আখিয়ার” কেতাবের লেখানুযায়ী উক্ত গম্বুজের প্রতিষ্ঠাতা খাজা হোসেন নাগেরী সাহেব। কিন্তু সমসাময়িক কেতাব একবালনামা জাহাঙ্গিরীর প্রণেতার বর্ণনা অনুযায়ী, সুলতান মাহমুদ খিলজীর শাসনকালে উক্ত গম্বুজটি তৈরী হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যা হোক, অনুরূপ নয়নাভিরাম গম্বুজ পাক ভারত উপমহাদেশের কোন স্থানে বর্তমান কালে মজুত আছে বলে প্রামাণ্য পাওয়া মুশকিল।

গম্বুজের অভ্যন্তর ভাগ নির্মাণ করা হয়েছে “সাজে রাস্তা” দ্বারা। উহার উপরে চুন দ্বারা গম্বুজের উপরের অংশ তৈরী করা হয়। কষ্টিক-পাথর দিয়ে পলেস্তারার কার্য সম্পন্ন করা হয়। দুগ্ধ ফেনিল গুঁড় গম্বুজের শীর্ষদেশে একটি উজ্বল স্বর্ণ কলস আছে।

প্রকাশ আছে যে, উক্ত স্বর্ণ কলসটি রামপুরের তৎকালীন নবাব হায়দার আলি খান নিজব্যয়ে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করেন। স্বর্ণ কলসের নিম্নদেশে স্বর্ণের রং চড়ানো একখানা সুন্দর মুকুট আছে।

মাজারের অভ্যন্তর ভাগে স্বর্ণ পানি এবং নানান প্রকার রং এর সংমিশ্রণে মনোরম কারুকর্ম করা হয়েছে। মাজারের অভ্যন্তরে

আড়ম্বরের এতই প্রাচুর্য যে, ধারণা করা হয়ত অতিরঞ্জিত হবে না যে, লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে উহার কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মাজারের নিম্নাংশ “যাফরাণের” বিখ্যাত শ্বেত মার্বেল পাথর দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। উক্ত শ্বেত পাথরের উপরে অত্যন্ত মূল্যবান জওয়াহরাত যথা-সাজেমুসা, এয়াশব, ফেরোজা প্রভৃতি পাথর দ্বারা কারুকর্ম করা হয়েছে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মাজার শরীফের এবং বেগমী দালানের মেরামত করার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় রামপুরের নবাব মোস্তাক আলি খান ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে উক্ত কার্য সমূহ সম্পন্ন করান। মাজারের উপরি ভাগে জরীর কারুকর্ম করা একখানা অত্যন্ত ব্যয় বহুল চাঁদোয়া টাঙ্গানো থাকে। গম্বুজের অভ্যন্তরের উপরের অংশে দেওয়ালের গায়ে চতুর্দিক বেষ্টন করে খাজা সাহেবের সম্মানে একখানা ভক্তিমূলক ফার্সী ভাষায় রচিত কবিতা লেখা আছে। উক্ত চিত্তাকর্ষক কবিতাখানা মাগরিবের নামাযের ১৫ মিনিট পূর্বে রৌশনী বা আলোক সজ্জা অনুষ্ঠানের সময় চার জন খাদেম সাহেব কবিতাখানা পাঠ করে খাজা সাহেবের প্রতি সালাম পেশ করেন।

## বেগমী দালান

মাজার সংলগ্ন উক্ত দালানের নামের দ্বারাই এর পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত দালানখানা জাহানারা বেগম নির্মাণ করেছিলেন। ঐ দালানখানার সাথে বাদশাহ শাহজাহানের সমসাময়িক অন্যান্য স্থাপত্যের যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। ২৫৩ হিজরী সনে এটা প্রস্তুত হয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু “মোয়ান্নেসুল আরওয়াহ” নামক কেতাবে জাহানারা বেগম, শাহজাহান মসজিদের বর্ণনা দান করে নীরবতা অবলম্বন করে গিয়েছেন।

বাবু হরবিলাসের বর্ণনা মতে, উক্ত দালানের শ্বেত মর্মরের মূল্যবান কাজ সমূহ জাহানারা কতুক সমাধা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বর্ণনা দান করেছেন যে, ছাদ এবং দেওয়ালের গায়ে স্বর্ণাক্ষরের কার্য করা আছে। সেটা রামপুরের নবাব মোস্তাক আলি খান কতুক সমাধা করা হয়েছে।

উক্ত দালানের অংশ বিশেষ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জলপাইগুড়ির নবাব-গোলাম কিবরীয়া

মেরামত করান। দালানখানা বহু মূল্যবান ঝালর বাতি দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে।

## জান্নাতি দরওয়াজা

আতায়ের রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর মাজারের পশ্চিম পার্শ্বে শাহজাহানী মসজিদের মিম্বর বরাবর একখানা দরওয়াজা আছে। মাজার সংলগ্ন উক্ত দরওয়াজাখানা উভয় পার্শ্বে রূপার পাত দিয়ে মোড়ানো। কথিত আছে যে, দরওয়াজাখানা বাবা ফরীদুদ্দিন গঞ্জশকর (রঃ) কর্তৃক নির্মিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুলতানের পাক-পটন নামক স্থানে গঞ্জশকর (রঃ) এর মাজারে একখানা জান্নাতি জানালা মওজুদ আছে। হয়তো উক্ত জান্নাতি জানালার নামের অনুকরণে খাজা সাহেবের মাজার সংলগ্ন দরওয়াজাখানার নামকরণ করা হয়েছে।

প্রতি চন্দ্র বছরের ২৯শে জামাদিউসসানী বেলা ২টা ৩০ মিটিটের সময় দরওয়াজাখানার কপাট উন্মুক্ত করা হয়। ৬ই রজব গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর ওরশ মোবারকের অনুষ্ঠান সমাপ্তির সাথে সাথে দরওয়াজাখানা বন্ধ করে দেয়া হয়।

ওরশ ব্যতীত বছরে ২ ঈদের দিনে এবং ৫ই শাওয়াল খাজা (রঃ) এর পীর ও মোর্শেদ হজরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ) এর মৃত্যু বার্ষিকীতে (ওরশ) উক্ত দরওয়াজাখানা উন্মুক্ত করা হয়।

আমি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বলতে পারি যে, উক্ত দরওয়াজা যখন উন্মুক্ত করা হয়, তখন ভক্তকুলের প্রচণ্ড চাপে বহু লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

হয়রত খাজা (রঃ) এর খাদেমগনকে বলতে শুনেছি যে উক্ত দরওয়াজাখানা ৭ বার প্রদক্ষিণ বা তাওয়াফ করলে বেহেশত লাভের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

## চিল্লাগাহ বাবা ফরীদুদ্দিন গঞ্জশকর (রঃ)

গরীবে নেওয়াজ (রঃ) মাজারের উত্তর পার্শ্বে সন্দলখানা মসজিদ

দের পশ্চিম পার্শ্বের দেওয়াল সংলগ্ন একখানা ছোট হুজুরা ধরণের ঘর আছে। উক্ত ঘরখানার নীচে আসন গ্রহণ করে বাবা ফরীদুদ্দিন গ শকর (রঃ) ৪১ দিন পর্যন্ত একাদিক্রমে খোদার ধ্যানে মগ্ন ছিলেন বিধায় উক্ত স্থানটিকে বাবা ফরীদের চিল্লাহ বলা হয়। উক্ত চিল্লাগাহের অভ্যন্তরে একখানা দরওয়াজা আছে। উক্ত দরওয়াজার মধ্যে দিয়ে খাজা সাহেবের কাঁচা মাজারে গমনা-গমন করা যেত। কিন্তু বহুকাল পূর্ব হতে উক্ত দরওয়াজাখানা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। প্রকৃত চিল্লাগাহটি ভূগর্ভে অবস্থিত। প্রতি চন্দ্র বছরের মহরম মাসের ৫ম তারিখে চিল্লাগাহ বাবা ফরীদুদ্দিন গঞ্জ শকর (রঃ) এর দরওয়াজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। অসংখ্য ভক্তকুল উক্ত দিবসে চিল্লাগাহে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে থাকেন।

দামামা বাদক উপর্যুপরি ৬ বার দামামার শব্দ করার পর পুনরায় ১বছরের জন্য দরওয়াজাখানা বন্ধ করে দেয়া হয়।

## আওলীয়া মসজিদ

দরগাহের সন্নিহিতে দৃশ্যতঃ ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উক্ত মসজিদখানা সন্দলি মসজিদের অনতিদূরে, মাজারের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। সম্ভবতঃ উক্ত মসজিদখানা খাজা (রঃ) এর আজমীর আগমনের পরে প্রথম মসজিদ। প্রবাদ আছে যে, উক্ত মসজিদখানায় খাজা সাহেব পাঞ্জেশানা নামাজ আদায় করতেন বলে সেটা আওলীয়া মসজিদ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

## সন্দলি মসজিদ

বিভিন্ন লেখকের বর্ণনায় লক্ষ্য করা যায়, উক্ত মসজিদখানা ৪টি নামে আখ্যায়িত। আবার ভিন্ন মতে ৫টি নামে পরিচিত।

বিভিন্ন মতামতের উপর এবং তথ্য প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে আমিও উপরোক্ত মসজিদের ৫ নামের উপর আস্থাশীল। যথা- মাহমুদী মসজিদ, জাহাঙ্গীরী মসজিদ, আলমগীরী মসজিদ, সন্দলখানা মসজিদ এবং ফুলখানা মসজিদ। “তাওয়ারীখে নিজামী” নামক গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী ৮৫৯ হিজরী সনে, আজমীর বিজয়ের পর সুলতান মাহমুদ খিলজী উক্ত মসজিদখানা নির্মাণ

করান। মসজিদখানা মাজারের সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। দরগাহ শরীফের নিকটবর্তী অট্টালিকাটি উক্ত মসজিদের পরম্পরায় নির্মিত হয়েছে। উক্ত মসজিদে ২য় নাম জাহাঙ্গীরী মসজিদ। প্রখ্যাত লেখক, রায় বাহাদুর, বাবু হরবিলাস সারদা কর্তৃক রচিত পুস্তক হতে জানা যায় যে, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের শাসনকালে হজরত মোজাদ্দেদ আল্‌ফেসানী (রঃ) আজমীর সফরে আসলে উক্ত মসজিদে নামায আদায় করেন।

হযরত মোজাদ্দেদে আল্‌ফেসানী (রঃ) নামাজ আদায়কালীন সময়ে উক্ত মসজিদের একটি দেওয়াল অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় পৌঁছেছিল। যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়ার আশংকায় লোকজন ভয়ে তটস্থ ছিল। লোকজনের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করে আল্‌ফেসানী (রঃ) বলেন, ভয়ের কোন কারণ নাই, দেওয়াল এখন ধসে পড়বে না।

হজরত আল্‌ফেসানী (রঃ) প্রত্যাবর্তন কালে, যখন আজমীর সীমানার বহির্ভাগে পদার্পণ করেন, তখন ভগ্নপ্রায় দেওয়ালটি ধসে পড়ে।

উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত দুর্ঘটনার পর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নির্দেশ অনুসারে, তাঁর কোন প্রশাসক উক্ত মসজিদের পুনঃ সংস্কার করান। তাই উক্ত মসজিদকে জাহাঙ্গীরী মসজিদ নামে অভিহিত করা হয়।

খাজা সাহেবের বার্ষিক ওরশের সময় এবং প্রত্যহ সন্দল বা চন্দন পিষে উক্ত চন্দন খাজা (রঃ) এর মাজারে ও মসজিদে লেপন করে দেয়া হয়। (এটা পরিক্ষিত যে, উক্ত চন্দন শেফার জন্য খুবই উপকারী)। এ জন্য উক্ত মসজিদকে সন্দলি মসজিদ বলা হয়। উপরন্তু প্রত্যহ ভোর ৫ টায় এবং বিকাল ৪ ঘটিকার সময়ে মাজারের পরিত্যক্ত ফুল উক্ত মসজিদের দক্ষিণ পশ্চিম কোণায় দরওয়াজার উত্তর পার্শ্বের একখানা তাকের মধ্যে জমা করে রাখা হয়। খাজা বাবার খেদমতে নিবেদিত ব্যক্তিগণ পরে উক্ত পরিত্যক্ত ফুল আন্দর কোটের একটি পরিখায় জমা করে। সে জন্য উক্ত মসজিদ ফুলখানা মসজিদ ও বলা হয়।

সম্রাট আলমগীরের শাসনকালে উক্ত মসজিদের সামান্য মেরামত কাজ সমাধা করা হয় বিধায় উক্ত মসজিদ আলমগীরী মসজিদ নামেও প্রসিদ্ধ।

### শাহজাহানী মসজিদ

এ মসজিদখানা ২টি নামে খ্যাতি লাভ করেছে। যথা- শাহজ

হানী মসজিদ এবং জামে মসজিদ।

১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে শাহজাহানের শাসনকালীন প্রখ্যাত কবি আবুতালেব কলিম হামদানী কর্তৃক রচিত মূল ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ কবিতায় উল্লেখ আছে যে, “কাবায় হাজাতে দুনিয়া মসজিদে শাহজাহা” তিনি অপর একটি কাব্যে উল্লেখ করেছেন, “কবলায়ে আহলে জ্বামাশুদ” উক্ত মসজিদের মেহরাবে সর্বমোট ৩৩টি কাব্য নকশা করা আছে। উক্ত কাব্যসমূহ হতেও প্রমাণিত হয় যে, বাদশাহ শাহজাহান মসজিদখানা নির্মাণ করেছিলেন।

“বনায় শাহেন শাহে রুয়ে জমীন” বাক্য হতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে এর নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়।

সিংহাসনে আরোহণ করার পূর্বে হতে বাদশাহ শাহজাহানের বাসনা ছিল যে, আজমীরে খাজা সাহেবের স্মরণে একখানা মসজিদ নির্মাণ করাবেন।

মসজিদখানা সম্পূর্ণরূপে মাকরাণের অত্যন্ত ব্যয়বহুল শ্বেত মার্বেল পাথরের দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। বিভিন্ন লেখকের মতে মসজিদ খানার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হতে ৯ বৎসরকাল সময় ব্যয় হয়। ভিন্ন মতে দেখা যায় যে, মসজিদখানা নির্মাণ কার্য সমাধা হতে ১৪ বছরকাল পর্যন্ত সময় লাগে। কিন্তু উক্ত উক্তির সপক্ষে যুক্তিযুক্ত তথ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

দৈর্ঘ্যে মসজিদখানা ১৪৮ ফুট, প্রস্থে ২৫ ফুট। গমনাগমনের জন্য ৩ খানা খোলা বা উন্মুক্ত দরজা আছে।

বাইরে উন্মুক্ত সেহেনের তিন পার্শ্বে শ্বেত মাকরাণী মার্বেল পাথরের প্রাচীর বেষ্টিত সেহেনে সর্বমোট ৫ খানা দরওয়াজা আছে। উন্মুক্ত সেহেনখানার দৈর্ঘ্য ১৫৬ ফুট এবং প্রস্থ প্রায় ৫৪ ফুট।

এটা আজমীরের বৃহত্তম জুমা মসজিদ। জুমার দিবসে দরগাহ শরীফের নিকটবর্তী এলাকার কোন মসজিদে জুমার নামায অনুষ্ঠিত হয় না। দূর দুরান্ত হতে বহুলোক উক্ত মসজিদে জুমার নামায আদায় করতে আগমণ করে। জুমার নামাযে কয়েক হাজার লোকের সমাগম হয়।

শাহী জামানা হতে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী, জুমার নামাযের প্রাক্কালে ৪ বার তোপধ্বনী করা হয়। ১ম বার ক্বাবলুল জুমা, ২য় বার খোৎবা প্রদানের সূচনাতে, ৩য় বার এক্বামতের সময়ে, ৪র্থ বার নামায খতম হলে।

প্রবাদে আছে যে, উক্ত মসজিদের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হবার পর, বাদশাহ শাহজাহান সর্বপ্রথম ২ রাকাআত শৌকরানা নামায আদায় করে খাজা (রঃ) এর দরবারে হাজিরা দেন।

### সাহেবজাদী মাজার

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর প্রিয়তমা কন্যা বিবি হাফেজ জামালের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর পিতার পাদদেশে মাজারের সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

তিনি পিতার উপযুক্ত কন্যা ছিলেন। বাল্য অবস্থায় কুরআনে হাফেজ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মহিলা সমাজকে শরীয়ত এবং মারেফতের দীক্ষা দানের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর নিকট হতে খেলাফত প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাঁর মাজার তৈরীর ব্যাপারে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নি। তবে অনুমান সাপেক্ষ বলা যায় যে, খাজা সাহেবের গম্বুজ নির্মাণের সময় সেটাও নির্মাণ করা হয়। খিলজী শাসকগণ অথবা বাদশাহ জাহাঙ্গীর কিংবা বাদশাহ শাহজাহানের আমলে সেটা নির্মিত হয়েছে। মাকরাণের বহুমূল্যবান শ্বেত মার্বেল পাথর দ্বারা গড়া হয়েছে উক্ত মাজার। অনুরূপ পাথরের জ্বালি দ্বারা এর চতুঃপার্শ্ব বেষ্টিত।

### বাদশাহজাদী হুরনুসা বেগমের মাজার

উক্ত মাজারটি জাহাঙ্গীরের নাতনী বাদশাহ শাহজাহানের পরম স্নেহভাজন কন্যা হুরনুসা বেগমের। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের উপস্থিতিতে তিনি ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ইহধাম ত্যাগ করেন। “তাজকারায়ে জাহাঙ্গীরী” কেতাবের বর্ণনা অনুসারে লক্ষ্য করা যায় যে, নাতনীর মৃত্যু শোকে অধীর হয়ে বাদশাহ

এক ফরমান জারী করেছিলেন যে, আগামীতে চার শব্বকে “গম শব্বা” বলতে হবে। কারণ ১০২৫ হিজরী সনের ৯ জমাদিউল আউয়াল বুধবার তাঁর আদরের নাতনীর মৃত্যু হয়েছিল।

উক্ত মাজারের উপরে অত্যন্ত মূল্যবান একখানা পোখরাজ পাথরের তক্তা লাগানো আছে। মাজারটি খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর মাজার শরীফের সংলগ্ন পশ্চিমদিকের দালানে অবস্থিত।

মাজারটি মূল্যবান মাকরাণের শ্বেত মার্বেল পাথরের জালি দ্বারা চতুঃপার্শ্বে আবদ্ধ করা আছে। বছরে একবার একখানা জালি অপসারণ করে উক্ত মাজারটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। উক্ত মাজারের ব্যাপারে কোনরকম ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় নি।

### বারাদরী দালান

মাজারের সেহেনের পূর্ব পার্শ্বে উত্তর দক্ষিণ লম্বা কেবলমাত্র খাঁস্বার (খাম) উপর নির্ভরশীল করে নির্মিত হয়েছে এ দালান।

### মাহফীলখানা বা ছামা খানা

উক্ত ভবনটি ২টি নামে আখ্যায়িত, যথা- মাহফিলখানা এবং ছামা খানা। বহুকাল দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হবার পর নবাব বশীরদৌলা একটি পুত্র সন্তান লাভ করে আনন্দের আতিশর্ষে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ৫ বৎসর অবাধ অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রচুর অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে ১৩০৯ হিজরী সনে এর নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করান।

অনুরূপ ছাদ বিশিষ্ট ভবন সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। বৈশিষ্ট্য পূর্ণ উক্ত দালানটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান (৪৬ ফুঃ x ৪৬ ফুঃ) এবং উহার ছাদও ৪৬ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

আজমীরের তৎকালীন কমিশনার জনাব কাজিম আলি কাশ্মিরী এবং দারোগা মীর হোসেন আলী সাহেবের তত্ত্বাবধানে সর্ব মোট ৮০,০০০

হাজার টাকা ব্যায়ে সেটা নির্মিত হয়।

প্রতি বৎসর আতায়ে রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এবং তদীয় পীর হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ) এর বার্ষিক ওরশের সময় কাউয়ালীর আসরের জন্য উক্ত ভবনের দরওয়াজা উন্মুক্ত করা হয়। তা ব্যতিত গুরুত্ব পূর্ণ অনুষ্ঠানাদিতেও এটা ব্যবহৃত হয়।

### বুলন্দ দরওয়াজা

দরগাহ শরীফের বৃহত্তম এবং উচ্চতম উক্ত প্রবেশ দ্বারটি নির্মাণের সঠিক তথ্য বর্তমানকাল পর্যন্ত কোন লেখক দিতে সক্ষম হননি।

অনুমানের উপর ভিত্তি করে এবং প্রবাদ বাক্যের বদৌলতে অনুমিত হয় যে, সুলতান মাহমুদ খিলজীর নির্দেশে দরওয়াজাটি নির্মিত হয়।

রায় বাহাদুর বাবু সারদা কর্তৃক প্রণীত পুস্তকে লক্ষ্য করা যায় যে, ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৫০০ খ্রীঃ এর মধ্যবর্তী সময়ে এটা নির্মাণ করা হয়। সুলতান মাহমুদের শাসনকালও ছিল ৩১ বৎসর। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, সুলতান মাহমুদ খিলজী কর্তৃক উক্ত দরওয়াজাটি প্রস্তুত করানো হয়েছে। দরওয়াজাটি সম্পূর্ণভাবে লাল পাথরের দ্বারা তৈরী।

বর্তমানকালে চুন দ্বারা পলেস্তারা কারানোর দরুণ, এর কারুকার্যতা এবং মৌলিকতা লুপ্তপ্রায়।

উক্ত দরওয়াজার অপর বিশেষণ হল “দশ ছত্ৰী গেইট।” এর উপরে উত্তর এবং দক্ষিণ পার্শ্বে দশটি ছাদ বিশিষ্ট কুঠরী আছে।

১৬৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রণীত একখানা পুস্তকের তথ্যে জানা যায় যে, উত্তর পার্শ্বের ছাদ দরওয়াজা তৈরী হবার বহু পূর্বে নির্মাণ হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। কারণ প্রত্যেকটি খামের গায়ে এখনও প্রাচীন জৈন মূর্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। উহার গঠন প্রণালীর সাথে প্রাচীন জৈন মন্দির সমূহের গঠন প্রাণালীর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

উপরোক্ত কারণে প্রমাণিত হয় যে, বুলন্দ দরওয়াজাটি পরে নির্মাণ করা হয়েছে।

### কর্ণাটকি দালান

উত্তরমুখী সনুখে উন্মুক্ত উচ্চ ছাদ বিশিষ্ট উক্ত দালানটি খাজা সাহেবের মাজারের পাদদেশে অবস্থিত। মূল্যবান শ্বেত পাথরের তৈরী। উক্ত দালানটি ১২০৭ হিজরী সনে কর্ণাটকের নবাব দলাজাহ রইস সাহেব প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর মহানুভবতার স্বীকৃতি স্বরূপ দিল্লীর তৎকালীন লেখক জনাব শাহ আলাম দেহলবী তাঁকে “আমীরুল হিন্দ” উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

### লঙ্গরখানা

লঙ্গরখানাটি আতায়ে রসুল, খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন! বিভিন্ন ধরণের মনস্কামনা পূরণার্থে লোকজন উক্ত লঙ্গরখানার খাবার গ্রহণ করে থাকে।

প্রত্যহ সকাল এবং সন্ধ্যায় একখানা প্রকাণ্ড কড়াই-এর মধ্যে যবের গুড়া এবং লবণ মিশ্রিত এক প্রকার তরল খাদ্য প্রস্তুত করে উহা খাজা (রঃ) এর ভক্তগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, ধনী দরিদ্র প্রায় সকলেই উক্ত খাদ্য গ্রহণ করে থাকে।

### আকবরী মসজিদ

শাহজাদা সেলিমের (জাহাঙ্গীর) জন্মের ৬ মাস পরে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ আকবর উক্ত প্রকাণ্ড মসজিদখানা নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। আকবরনামা ২য় খণ্ডের প্রণেতার বর্ণনা মতে ৯৭৮ হিজরী সনে উক্ত মসজিদের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। সম্পূর্ণ লাল পাথর দ্বারা মসজিদখানা নির্মিত হয়েছে। মূল্যবান পাথরে কারুকার্য খচিত মেহরাবটি অতুলনীয়।

কয়েকখানা অট্টলিকাকে উক্ত মসজিদের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এর ছাদ দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৪×১৪ ফুট এবং উচ্চতা ৫৬ ফুট। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে নবাব গফুর আলি দানাপুরী উক্ত মসজিদের কিছু প্রয়োজনীয় মেরামত কার্য সম্পন্ন করান।

১২৫ খাজা গরীবে নেওয়াজ

## শাহজাহানী নহবতখানা

বা

### কলেমা দরওয়াজা

নহবতখানা নির্মাণের ব্যাপারে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। দরগাহ সঙ্ঘীয় বর্ণনাকারীগণ বাদশাহ শাহজাহানের শাসনকালে এটা তৈরী হয় বলে দাবী করেন। ভিনু মতাবলম্বী লেখকগণ দাবী করেন যে, সেটা ১০৪৭ কিংবা ১০৪৫ হিজরী সনে তৈরী হয়েছে। বাদশাহ শাহজাহানের অন্যান্য অট্টালিকার সাথে এর তুলনা করলে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তথাপিও এটা শাহজাহানী নহবতখানা হিসেবে পরিচিত। মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ুনী কর্তক প্রণীত বাদশাহ আকবরের শাসনকালীন রচনাবলীতে লক্ষ্য করা যায় যে, ভারত বিজয়ের পরে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে নহবতখানা নির্মাণ করে পূর্বোক্ত নহবতখানার সাথে সংযুক্তির নির্দেশ দেন।

সুতরাং এটা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে, উক্ত নহবতখানাটি বলন্দ দরওয়াজা কিংবা আকবরী মসজিদের সমসাময়িক।

বাদশাহ শাহজাহান কর্তৃক উহা সংস্কারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

উক্ত দরওয়াজার উত্তর পার্শ্বে মেহরাবের উপরিভাগে কলেমায়ে তৈয়বার নকশা করা আছে বিধায় উক্ত দরওয়াজা কলেমা দরওয়াজা নামেও পরিচিত।

সম্পূর্ণ অট্টালিকাটি লাল পাথরের তৈরী। কিন্তু চুনার পলেস্তারা করার ফলে, এর স্বকীয়তা লুপ্ত প্রায়।

আনুমানিক ৪২ বছর পূর্বে খাজা সাহেবের একজন ভক্ত দরওয়াজার কপাটগুলি রূপা দ্বারা আবৃত করে দিয়েছেন।

### ওসমানী নহবতখানা

দাক্ষিণাত্যের নবাব যখন ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর আজমীর ভ্রমণে আগমণ করেন, সেই সময় উক্ত নহবতখানাটি নির্মাণের নির্দেশ দেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

১২৬ খাজা গরীবে নেওয়াজ

সরকারী স্থপতি মিঃ এ নিকলেশ-এর পরিকল্পনা এবং সরকারী কর্মচারী মৌলভী হাবিবুল্লাহ সাহেবের তত্ত্বাবধানে এটা নির্মিত হয়।

দিল্লীর একজন প্রখ্যাত হিন্দু ঠিকাদার দুই বৎসরকাল অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এর নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করেন।

### ঝাল্লারা বা প্রস্রবণ

গরীবে নেওয়াজ (৪ঃ) এর অন্যতম কেলামত প্রস্রবণ মাজারের পাদদেশে অবস্থিত। বালু এবং পাথর মিশ্রিত রুক্ষ মরুভূমি রাজস্থানে অনুরূপ সুপেয় প্রস্রবণ বোধহয় দ্বিতীয়টা নাই।

আজমীরের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা খাদেম মহল্লা, আন্দরকোট, দরগা শরীফ প্রভৃতি স্থানে যান্ত্রিক উপায়ে উক্ত প্রস্রবণ হতে প্রত্যহ পানি সরবারহ করা হয়।

### শাহকুলির মাজার

মাজারটি শাহানশাহ আকবরের আজমীর প্রশাসকের মৃত্যুর পূর্বে তিনি গরীবে নেওয়াজ (৪ঃ) আশে পাশে কোথাও সমাধিস্থ হবার মানসে জীবিত অবস্থায় কবরটি প্রস্তুত করে রাখেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল না যে, তিনি স্বীয় পছন্দসই স্থানে সমাধিস্থ হন। ১০০৮ হিজরী সনে স্বীয় আবাসভূমিতে মৃত্যুবরণ করলে তথায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। অতএব কবরটি খালি ছিল কিন্তু পরে অপর কোন ব্যক্তিকে উক্ত কবরে সমাধিস্থ করা হয় বলে প্রবাদ আছে।

### শেখ হোসেনের মাজার

শাহানশাহ আকবরের শাসনকালে খাজা সাহেবের বংশধর বলে দাবীদার শেখ হোসেনকে উক্ত কবরে সমাধিস্থ করা হয়।

সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম প্রখ্যাত সদস্য আবুল ফজল প্রণীত “আকবর নামার” দ্বিতীয় খণ্ডে শেখ হোসেনকে খাজা সাহেবের বংশের ভূয়াদাবীদার বলে আখ্যায়িত করেন। উক্ত উক্তির উপর ভিত্তি করে শাহানশাহ আকবর তাকে আজমীর হতে বহিস্কার করেন। “আকবরনামার” ৩য় খণ্ডের বর্ণনায় লক্ষ্য করা যায় যে, অনবরত তদ্বীরের ফলে অনেকদিন পর বাদশাহ

আকবর তাকে পুনরায় দরগাহ শরীফের লঙ্গরখানার দায়িত্বে নিয়োজিত করে আজমীরে অবস্থানের অনুমতি দান করেছিলেন।

### ষোল খাশা মসজিদ

সর্বমোট ১৬টি খামের সাহায্যে উক্ত ইমারতখানা নির্মিত হয় বলে উক্ত অট্টালিকাটিকে ষোল খাশা মসজিদ বলা হয়। মসজিদের নমুনায় এর তৈরী হলেও এর অভ্যন্তরে কয়েকটি কবর দৃষ্টিগোচর হয়।

এটা উন্নতমানের শ্বেত মার্বেল পাথর দ্বারা নির্মিত এবং চতুষ্পার্শ্বে শ্বেত মার্বেল পাথরের জালি দিয়া ঘেরা ছিল। বর্তমান কালেও কিছু কিছু জালি অবশিষ্ট রয়েছে।

উক্ত-দালানে খোদাই করা যে তারিখ উল্লেখ আছে, তাতে প্রমাণিত হয় যে, সেটা ১১৩৩ হিজরী সনে তৈরী হয়।

কিন্তু “আহসানুসচায়া” নামক কেতাবে সেটা ১০৭০ হিজরী সনে তৈরী হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

### চারি ইয়ার

শাহজাহানী মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে পশ্চিম দিকে গমনের একখানা দরওয়াজা আছে। উক্ত দরওয়াজা দিয়ে গমন করলে একটি কবর স্থান দৃষ্টিগোচর হবে।

প্রবাদ আছে যে, উক্ত কবরস্থানে বহু ওলী আল্লাহ এবং খাজা (রঃ) এর চার জন বিষ্ণু সার্থী কবর আছে। এজন্য উক্ত কবর স্থানকে চারি ইয়ার বলা হয়।

### দালান উজীর আলি

#### বা আড়কট দালান

দালানটি কর্ণাটকী দালানের সাথে সংযুক্ত পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। উক্ত উঁচু ছাদ বিশিষ্ট দালানটি আতায়ের রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর একজন খাদেম সৈয়দ হাজী উজীর আলি সাহেব কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।

### শাহী হাউজ

শাহজাহানী মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি পানির হাউজ আছে। প্রবাদ আছে যে, সেটা ১৯১১ খৃঃ ইংরেজ শাসনকালে কোন এক ভাইসরয় কুইন মেরীর নির্দেশে প্রস্তুত করেছিলেন।

### আড়াই দিনের ঝোপড়া

#### জামেয়া আলতামাস

বাবু ঈশ্বরী প্রসাদ কর্তৃক প্রণীত “তাওয়ারীখে হিন্দ” নামক পুস্তকের ৬৭ পৃষ্ঠায় আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্বে আড়াই দিনের ঝোপড়া (দাই দিনকা জুম্বী) নির্মিত হয়।

“হাজেকায়ে রাজস্থান” নামক একখানা পুস্তকের বর্ণনা মতে সুলতান মাহমুদ গজনবী সোমনাথ অভিযানে আগমণের প্রাক্কালে আজমীর হয়ে যান এবং সোমনাথ মন্দির হতে অজ স্র ধনরত্ন নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময়ও আজমীর হয়ে প্রস্থান করেন।

তৎকালীন আজমীরের রাজা সুলতানকে ভূষ্ট করার মানসে উক্ত ঝোপড়াটি আড়াই দিনের মধ্যে প্রস্তুত করায় সুলতানকে বলেছিলেন, মান্যবর, যেহেতু আজমীরে আপনি সদলবলে নামায আদায় করবার মত কোন উপযুক্ত মসজিদ বা স্থান নাই সেহেতু আপনার উপাসনার সুবিধার্থে আমি উহা প্রস্তুত করেছি। উপরোক্ত আয়োজনে সুলতান যারপরনাই আনন্দিত হন এবং উক্ত জায়গায় নামায আদায় করেন। উপরোক্ত কারণে একটি প্রকাণ্ড দালানকে লোকজন বর্তমান কালেও “আড়াই দিনের ঝোপড়া” বলে থাকে। দালানটি পশ্চিম দিকে, দিক নির্দেশ করে প্রস্তুত করা হয়েছে। দালান সংলগ্ন অপপার ভবনগুলিও পশ্চিমদিক নির্দেশক।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, আহমেদাবাদের জামে মসজিদও অনুরূপভাবে তৈরী করা হয়েছে।

বাবু হরবিলাস সারদা কর্তৃক প্রণীত পুস্তক “আজমীর” এর বর্ণনানুসারে অর্জিত নামক একজন শাসনকর্তা আজমীর আগমণ করে উক্ত স্থান হতে মুসলমানকে উচ্ছেদ পূর্বক মসজিদ খানাকে মন্দিরে রূপান্তরিত করেন। বস্তুতঃপক্ষে উক্ত মসজিদের খামগুলি লক্ষ্য করলেও তা সহজে অনুমান করা যায়। এখনও বহু মূর্তির ধ্বংসাবশেষ মসজিদের পূর্বপার্শ্বে মালখানায় প্রাক্তন স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে সংরক্ষিত আছে।

দওলত রায় সন্ধ্যার শাসনকালে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সমস্ত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য

## খাজা গরীবে নেওয়াজ ১২৯

করে উক্ত মসজিদের দরওয়াজার উপর তিনি একটি শপথ বাক্য খোদাই করেছিলেন। সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি আমার অনুরোধ রইল, তোমরা কেহ এই দালানের ক্ষতি সাধন কর না।

জামেয়া আলতামাশ একখানা প্রকাণ্ড মসজিদ। সম্ভবতঃ এটা আজমীরের বুকে প্রথম আল্লাহর ঘর।

এর মেহরাবে এবং দরওয়াজার উপরিভাগে কুরআন শরীফের আয়াত খোদাই করা আছে।

বাদশাহ আলতামাসের অন্যান্য স্থাপত্যের সাথে যেমন “কুতুব মিনার” দিল্লীর “কুউওয়াতুল ইসলাম” মসজিদের সহিত আড়াই দিনের ঝোপড়ার যথেষ্ট মিল রয়েছে।

গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর মাজার হতে অন্দরকোটের সদর রাস্তা হয়ে পশ্চিম দিকে ত্রিপলী গেট দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে যাত্রা করলে বাম পার্শ্বের লাল পাথর দ্বারা তৈরী অটালিকাটিই “দাই দিনকা জুম্মী” বা আড়াই দিনের ঝোপড়া।

### প্রকাণ্ড দেগ

সম্রাট আকবর চিতোর আক্রমণ করার পূর্বে আন্তানায় খাজা (রঃ) এর দরবারে হাজিরা দিয়ে চিতোর জয় করার পর মহাসমারোহে আজমীর আগমণ করেছিলেন।

প্রবাদ আছে যে, তিনি খাজা সাহেবের সম্মানে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম মৌসুমে সুদূর আধা হতে ২৩২ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে আজমীর আগমণ করেছিলেন। আগমণ পথের উভয় পার্শ্বে অপেক্ষমান লোকজনকে অজস্র টাকা পয়সা বন্টন করতে করতে আজমীর পৌঁছে খাদেমগণকেও বিস্তর টাকা দান করেছিলেন।

চিতোর বিজয়ের পরে আজমীর আগমণ করে ১২৫ মণ খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম এমন একটি প্রাকাণ্ড দেগ তৈরী করান।

১৭৬ হিজরী সনে তিনি উক্ত দেগ তৈরী করায় তাঁর উপস্থিতিতে খাদ্য প্রস্তুত করান এবং উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে উক্ত খাবার পরিবেশন করান।

উক্ত দেগের উপরিভাগের ব্যাস সাড়ে বার গজ। উক্ত দেগে খাজা ভক্তগণ স্বর্ণ, রৌপ্য, টাকা, পয়সা এবং বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করে থাকে।

## খাজা গরীবে নেওয়াজ ১৩০

উক্ত দেগ লুঠনের দৃশ্য সত্যিই দর্শনীয়। মান্নত হিসাবে যখন কোন লোক উক্ত দেগে অনু প্রস্তুত করান, তখন অন্দরকোটের বাসিন্দাগণ মৌরসী সত্ত্বের অধিকার বলে দেগ লুঠনের জন্য সারা রাত্রি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে এবং দেগের পার্শ্ব জড়ো হতে থাকে।

খুব ভোরে অনু প্রস্তুতের কার্য সমাপ্ত হবার সাথে সাথে দেগ লুঠন আরম্ভ করা হয়। সে সময়ে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। লুঠনকৃত উক্ত খাদ্য পরে খাজা (রঃ) ভক্তগণের মধ্যে বিক্রি করা হয়। উপরোক্ত দেগ এখনও মঞ্জুদ আছে।

### ছোট দেগ

বাদশাহ জাহাঙ্গীর বহুবাব খাজা (রঃ) এর জেয়ারতে আগমণ করেছিলেন। কিন্তু একবার তিনি একাক্রমে ৩ বৎসরকাল আজমীরে অবস্থান করেন এবং উক্ত সময়ে ৬০ মন ওজনের খাবার প্রস্তুত করতে সক্ষম এমন ১টি দেগ তৈরী করান। তাঁর উপস্থিতিতে উক্ত দেগে খাবার রান্না করায় প্রায় ৫ হাজার লোককে খাবার খাওয়ান।

উক্ত দেগের খাবারও লুঠন করা হয় এবং অদ্যাবধি সেটা মঞ্জুত আছে।

### চিল্লাগাহে খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ)

আতায়ে রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর চিল্লাহ গাহ (এবাদতের স্থানটি) অতীব প্রাচীন এবং প্রশস্ত। এটা আনা সাগরের দক্ষিণ পূর্বদিকে সদাবাহার পাহাড়ের ঢালুতে অবস্থিত উক্ত গুহায় দুইকানা তক্তপোষ আছে। প্রবাদ আছে যে, ঐ তক্তপোষে আসন গ্রহণ পূর্বক খাজা আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকতেন।

তদানিন্তন আজমীর প্রশাসক সুবাদার মুহাম্মদ খাঁ ১০৩৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত চিল্লাগাহ (গুহা)-টিকে পাথর দ্বারা সজ্জিত করায় একখানা দরওয়াজার বন্দোবস্ত করেছিলেন। দরওয়াজার উপরি ভাগে একটি ফার্সী কাব্যও তিনি নকশা করান “সাঁখতায় মকানে “চিল্লাগাহে চিশ্ত তাবুদ এয়াদগারে উবাহে জমিন। “চিল্লাগাহের পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ এবং গুড়বী শাহবাবার মাজারসহ অনেকগুলি মাজার দৃষ্টিগোচর হয়।

## বড়পীর সাহেবের চিল্লাহ

দরগাহ খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর দক্ষিণ পার্শ্বে তারাগড় পাহাড় সংলগ্ন পাহাড়ের উপর সবুজ গম্বুজওয়ালা দালানখানা বড়পীর সাহেবের চিল্লা হিসেবে পরিচিত। যদিও বা হজরত গাউস পাক কখনও পাক ভারত উপমহাদেশে আগমন করেননি। প্রবাদ আছে যে, একজন দরবেশ গউসুল আজম দস্তগীর (রঃ) এর মাজার হতে এককানা পাথর বা ইট বাগদাদ হতে সঙ্গে করে আজমীর আনয়ন করেছিলেন। উক্ত দরবেশের অন্তিম অভিপ্রায় অনুসারে সে ইটখানা তাঁর সাথে একই কবরে সমাধিস্থ করা হয়।

## কালোরাত্রির কবলে তারাগড়ের কেলা

সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবকের কেলাদার মিরহুসাইন (রঃ) খাজা সাহেবের অত্যন্ত প্রিয় মুরীদ ছিলেন। সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবক অশ্ব হতে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে রাজপুতগণ রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণ করে সৈয়দ মির হুসাইন (রঃ) সহ অসংখ্য মুসলমান যোদ্ধাকে হত্যা করে। পরের দিন ভোরে খাজা সাহেব খবর পেয়ে লোকজন সহকারে তারাগড় কেলায় গমন করেন এবং নামাযে জানাজা আদায় পূর্বক তাঁদের সমাধিস্থ করেন।

লোকজন উক্ত শহীদগণের মাজার জেয়ারত করবার জন্য তথায় গমন করে থাকেন।

তারাগড়ের ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হতে আমি বিরত রইলাম। কারণ বর্তমানে তারাগড় কেলাকে সঞ্চাল করে শিয়া সম্প্রদায় নানা প্রকার অমূলক কাহিনী বলে থাকেন।

## খাজা কুতুবুদ্দীন বখতেয়ার কাকী (রঃ) এর চিল্লাগাহ

হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতেয়ার কাকী (রঃ) এর চিল্লাগাহটিও খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর চিল্লাগাহ এর পূর্বদিকে সদাবাহার পাহাড়ের পূর্বে ঢালুতে অবস্থিত। তথায়ও একখানা ক্ষুদ্র মসজিদ এবং বহু কবর মজুদ আছে।

## যোগী অজয় পালের মন্দির আবদুল্লাহ বেয়াবাণী (রঃ)

যোগী অজয় পাল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে আজমীর আগমণ করে যে মন্দিরখানায় পূজা পার্বন করত, এটাও গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর চিল্লাগাহের একই পাহাড়ে অবস্থিত। চিল্লাগাহের অনতিদূরে উক্ত মন্দিরে অজয় পালের বিকট কাল্পনিক ছবি সংরক্ষিত আছে।

## আতায়ের রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর অলৌকিক ঘটনাবলী

এ ক্ষুদ্র পুস্তকে খাজা (রঃ) এর কেলামত লিপিবদ্ধ করা বাতুলতা মাত্র। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি কার্যক্রম ছিল অলৌকিকতায় ভরপুর। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সংক্ষিপ্তাকারে স্বল্প সংখ্যক কেলামত লিপিবদ্ধ করেছি মাত্র।

## দিনে আজমীর রাত্রে ক্বাবায়

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর জীবদ্দশায় আজমীরবাসীগণ হজ্জ সম্পাদনান্তে প্রত্যাবর্তন করে প্রায়শঃ বলতো “হজুর! ক্বাবা শরীফ হতে কখন আজমীরে আগমণ করেছেন?” উপস্থিত লোকজন প্রত্যত্তরে বলতো “তিনি এ বছর হজ্জ গমন করেননি।”

হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তনকারীগণ বলতো, “তাঁকে আমরা কাবা শরীফ তাওয়াফ করতে দেখেছি। উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি রাত্রে স্ব-শরীরে খানায় কাবা প্রদক্ষিণ করতেন এবং ভোরে আজমীরে উপস্থিত হয়ে বা জামাআতে ফজরের নামায আদায় করতেন।

## স্বীয় খানকা থেকে পীরের মাজার দর্শন

একদা খাজা কুতুবুদ্দীন বখতেয়ার কাকী (রঃ) সহ বহু সংখ্যক দরবেশগণের উপস্থিতিতে খাজা সাহেব দরবেশী এবং এবাদত বন্দেগী সম্বন্ধে আলোচনারত অবস্থায় হঠাৎ দগ্ধমান হয়ে পড়েন। উক্ত আলোচনা সভায় বেশ

কয়েকবার অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়। পরে বখ্তেয়ার কাকী (রঃ) এর কারণ জ্ঞাত হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে, খাজা (রঃ) বলেন, ঐদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মাত্র আমার পীর ও মোর্শেদ হযরত ওসমান হারুনী (রঃ) এর মাজার আকদস্ আমার মানস চক্ষে ভেসে উঠে। তাঁর সম্মানে আমি অনুরূপ করেছি।

## খোদার হুকুমে খাজা সাহেব কর্তৃক নিহত যুবকের প্রাণ দান

একদা এক প্রৌঢ় লোক খাজা সাহেবের দরবারে উপস্থিত হয়ে নগরীর হাকীমের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে বলল, “হুজুর নগরের হাকীম অন্যায় ভাবে আমার পুত্রকে হত্যা করে আমাকে পুত্রহারা করেছে। তার বিয়োগ ব্যথা সহ্য করতে অপারগ হই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। অনুগ্রহপূর্বক এর বিহিত ব্যবস্থা করুন। খাজা (রঃ) তখন ওজুরত অবস্থায় ছিলেন। বৃদ্ধের করুণ কাহিনী শ্রবণ করে তাঁর দয়ার সাগর উখলিয়ে উঠল। স্বীয় লাঠিখানা হস্তে ধারণ করে বৃদ্ধের বাসগৃহে যান। মৃত যুবকের নিকটে উপস্থিত হয়ে তিনি অল্পক্ষণ মৌনভাবে অবস্থান করেন। উপস্থিত জনগণ, সাথী খাদেমগণ এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ পরবর্তী ঘটনা অবলোকনের জন্য অধীর আশ্রমে অপেক্ষা করতে থাকেন।

অল্পক্ষণ পরে খাজা সাহেব মৌনতা ভঙ্গ করে খণ্ডিত মস্তক শরীরের সাথে যুক্ত করে যুবককে উদ্দেশ্য করে বলেন “হে লাঞ্চিত, তুমি যদি সত্যিই নিরপরাধ হও, তবে খোদার হুকুমে জিন্দা হও।” উপরোক্ত বাক্য উচ্চারণের সাথে সাথে নিহত যুবক কলেমা শরীফ পাঠ করতে করতে দণ্ডায়মান হয়ে গেল। বৃদ্ধের হস্তে পুনরুজ্জীবিত ছেলেকে অর্পণ করে তিনি সদলবলে স্বীয় আস্তানায় প্রত্যাবর্তন করেন।

## স্বীয় মুরীদের অবমাননার চরমতম দণ্ড

একদা হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) স্বীয় মুরীদান ও ভক্তগণ বেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় তাঁর অন্য একজন মুরীদ দরবারে আগমন করে শহরের হাকীমের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে বললেন, “হুজুর নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও শহরের হাকিম অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করে আমাকে শহর হতে বহিষ্কার করে দিয়েছেন।

উপরোক্ত অভিযোগ শ্রবণ করে খাজা (রঃ) গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন।

কিছুক্ষণ পর ধ্যান ভঙ্গ করে স্বীয় মুরীদকে লক্ষ্য করে খাজা সাহেব বললেন “হাকীমের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে ইচ্ছুক নই তবে মনে হয় তিনি আদম বাগানে যাত্রা করেছেন।”

উক্ত বাক্য শ্রবণ করে মুরিদ স্বীয় আবাস স্থলে প্রত্যাবর্তন করে জ্ঞাত হন যে, হাকিম সাহেব শহরের বহির্ভাগে অশ্রু হতে পতিত হয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

## বাদশাহী লাভের আগাম খবর

একদা সফরকালীন সময়ে খাজা সাহেব শেখ শাহাবুদ্দীন সোহরোওয়াদী (রঃ), শেখ ওয়াহেদুদ্দীন কিরমানী (রঃ) গোঁড়ী রাজ্যে একটি গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হন। তথাকার এক নব্য যুবক তীর এবং বন্দুক সজ্জিত অবস্থায় তাঁদের সম্মুখ দিয়ে গমন কালে খাজা সাহেব উক্ত যুবককে নিকটে আহ্বান করে নাম জিজ্ঞেস করলেন।

যুবক বলল, আমার নাম শাহাবুদ্দীন। অতঃপর সাথী মহাত্মাগণকে লক্ষ্য করে খাজা (রঃ) বললেন, খোদার হুকুমে অচিরে এই যুবক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করবে।

পরবর্তীকালে উক্ত যুবক শাহাবুদ্দীন ঘোরী নাম ধারণ করে পৃথীরাজের সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেছিলেন।

## গুপ্ত তথ্য ফাঁস

একদা দিল্লী অবস্থান কালে খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) এর দরবারে পৃথীরাজের গুপ্তচর হিসেবে তদীয় একজন মুসলমান কর্মচারী উপস্থিত হয়ে মুরীদ হবার প্রবল বাসনা প্রকাশ করল। কিন্তু খাজা সাহেব উক্ত ব্যক্তিকে মুরীদগণের অন্তর্ভুক্তিতে অনাসক্তি প্রকাশ করায় সে পৃথীরাজের নিকট গমন করে অভিযোগ জানালো। রাজা একজন কর্মচারী পাঠিয়ে উক্ত মুসলমানকে মুরীদ না করার হেতু জানতে চাইল।

তদুত্তরে খাজা (রঃ) বললেন, “তিনটি কারণে তাকে মুরীদ হিসেবে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হইনি।”

প্রথমতঃ উক্ত ব্যক্তি একজন চরম বিশ্বাসঘাতক। দ্বিতীয়তঃ সে আমার মুরীদগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। তৃতীয়তঃ সে বেঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। উপরোক্ত জবাবে পৃথীরাজ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় রাজ দরবারে ঘোষণা করে যে, “এই দরবেশ আগাম বক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আকাঙ্ক্ষিত হওয়ায়, অদ্য হতে তিন দিনের মধ্যে আমার রাজ্যের ত্রিসীমানা হতে বহিষ্কারের নির্দেশ দেয়া হল।

খাজা সাহেব রাজার ফরমান জ্ঞান হয়ে জ্বালালী হালতে নিম্নোক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেন “তিন দিনের মধ্যে রাজ্য হতে কে বাহির হয় দেখা যাবে।”

তিনদিন অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই সুলতান শাহাবুদ্দীন কর্তক হিন্দুস্থান অভিযানের খবর শুনে ব্যতিব্যস্ত অবস্থায় পৃথীরাজ স্বসৈন্য আজমীর ত্যাগ করে।

মাত্র এক দিনের যুদ্ধে পৃথীরাজের সম্মিলিত বাহিনী শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করে। সরস্বতী নদীর তীরে পৃথীরাজকে বন্দী করা হয় এবং পরে শিবচ্ছেদ করা হয়। পূর্বে আলোচিত মুরীদ হবার অভিলাসী ব্যক্তিটিও উক্ত যুদ্ধে নদীতে ডুবে প্রাণ হারায়।

## অনলের করাল গ্রাস হতে ওলী আল্লাহগণের পাদুকাও মুক্ত

একাদা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) ভ্রমণরত অবস্থায় সাতজন অগ্নি উপাসকের একটি দলকে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে পূজারত অবস্থায় দর্শন করে তথায় গিয়ে উপস্থিত হন। অগ্নি উপাসকগণ হযরতের নুরাণী চেহারা দর্শন করা মাত্র তাঁর চরণের উপর লুটিয়ে পড়ে। খাজা সাহেব তাদের অগ্নি পূজার উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে চাইলে অগ্নি উপাসকগণ বলল, “হুজুর, আমরা নরকের আগুন হতে রক্ষা পাবার জন্য, এর পূজা করে আসতেছি।”

উক্ত জবাব শ্রবণ করে খাজা (রঃ) বলেন, “ওহে নির্বোধের দল, খোদার আদেশ ব্যতীত আগুনের কোনরূপ কর্মশক্তি নাই। যে প্রভুর আদেশে আগুন কর্মক্ষম, তার উপাসনা না করে কেন তাঁর সৃষ্টির উপাসনায় মত্ত রয়েছ?”

অগ্নি উপাসকগণ খাজা (রঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলল, তা হলে অনল কি আপনার ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম নয়? প্রতি উত্তরে খাজা সাহেব বললেন “মঈনুদ্দীনের কথা রাখ, খোদার হুকুম ব্যতীত তার পায়ের জুতারও কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।” এ কথাগুলো বলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জুতা জেড়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন।

কিছুক্ষণ পর সবাই লক্ষ্য করল যে, খাজা সাহেবের জুতা জোড়া অবিকল অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।

উক্ত অগ্নি উপাসকগণ, খাজা সাহেবের অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে গভীর আস্থার সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ পূর্বক বহুকাল অবধি গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর খেদমতে কাটান।

## পরশমণি

প্রবাদ আছে যে, গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর দরবারে কোন ব্যক্তি তিনদিন অবস্থান করলে মোমেন ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হতেন। উক্ত অলৌকিকতার খবর শ্রবণ করে দূর দুরান্ত হতে অনেক ব্যক্তি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ওলীত্ব প্রাপ্ত হন।

## দৃষ্টিতেও কেলামত

একদা খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) হক ও বাতেল সম্বন্ধীয় শুদ্ধি অভিযানে একটি মন্দিরে গমন করেন। উক্ত মন্দিরে তখন নগরের সাত জন ধনাঢ্য এবং সম্ভ্রান্ত পূজারী ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিল।

তিনি যখন গভীর অন্তরদৃষ্টিতে তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন তখন পূজারীগণের অন্তরে আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং তারা খাজা (রঃ) চরণ ধুলি গ্রহণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ পূর্বক মুসলমান হয়ে যায়।

## নূরের কোলাকোলী

একাদা বাগদাদে গাউসুল আজম দস্তগীর হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) গরীবে নেওয়াজ (রঃ)কে দাওয়াত দিয়েছিলেন।

কিন্তু খাজা সাহেব স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করে খবর প্রেরণ করেন যে, চিশতীয়া পন্থীগণের হৃদয়ের পথ্যদান করতে স্বীকৃত হলে দাওয়াত রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। প্রতি উত্তরে পীরানে পীর (রঃ) বলেন যদিওবা “ছামা” আমার মনঃপূত নয়, তথাপিও আপনার সম্মানার্থে “ছামা” অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করা হল।

নিমন্ত্রিত মেহমানগণকে আপ্যায়নের পর বড়পীর সাহেব স্বীয় খাদেমকে কিছু নির্দেশ দান করে তিনি “ছামা” অনুষ্ঠান আরম্ভ করার অনুমতি প্রদান করেন।

বাদ্য বাজনার সাথে যখন ছামা আরম্ভ হয়, তখন গউছেপাক স্বীয় লাঠিখানা নিয়ে অনুষ্ঠানের বাইরে একস্থানে দণ্ডায়মান হন। ক্রমান্বয়ে ছামা মজলিস সরগম হয়ে এইরকম এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, দরবেশগণ গভীর তন্ময় হয়ে বেখোদির অবস্থায় শুধু বলতে থাকেন “হে খোদা, তুমি দয়া কর।”

অপরদিকে মজলিসের গভীরতা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন ওটার গভীরতা উপলব্ধি করে পীরানে পীর সাহেব স্বীয় লাঠি দ্বারা ভূমি চেপে ধরেন। মজলিস চরমে উঠলে তিনি এতই শক্তি প্রয়োগ করেন যে, তাঁর চেহারা মোবারক রক্তাক্ত হয়ে পড়ে।

অতঃপর তিনি এবং গরীবে নেওয়াজ (রঃ) সম্মিলিতভাবে মজলিসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন বড়পীর সাহেবের নিকট হতে “ছামা” চলাকালীন সময়ে অননুষ্ঠিতভাবে মাটি চেপে ধরার হেতু জ্ঞাত হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে তিনি বলেন- আমি মাটি দ্বারা ভূমণ্ডলকে চেপে রেখেছিলাম। যদি আমি মজলিসে অংশ গ্রহণ করতাম অথবা ভূমি চেপে না রাখতাম তাহলে হয়ত ক্বাজায় কেয়ামত অদ্যই অনুষ্ঠিত হত। অহেতুক জান ও মালের সমূহ ক্ষতি সাধিত হত।

কবরের মধ্যে অবস্থান করেও ভক্তগণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

হজরত মৌলানা জালালুদ্দীন মাখদুম জাঁহানিয়া জাঁহাগশত (রঃ) স্বীয় ভ্রমণ কাহিনীতে গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর মাজার জেয়ারতকালীন ঘটনার যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা উদ্ধৃত করলামঃ

ফকির যখন গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর মাজারে উপস্থিত হয়ে বললাম, আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আপনার হস্ত মোবারক প্রদান করুন, আমি মোসাফাহা করি। ঠিক সে মুহূর্তে আমার সালামের প্রতি উত্তর সহকারে হস্ত মোবারক প্রসারিত করেন এবং আমি স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি।

## আতায়ে রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) তিরোধানের পরবর্তী ফয়ুজাত

খাজা সাহেবের তিরোধানের পরেও অসংখ্য লোক তাঁর নিকট হতে ফয়েজ হাসেল করেছেন, বর্তমান কালেও করতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন।

অনেক সংক্ষেপ করেও কেন যেন পুস্তকখানার পরিসর রোধ করা যাচ্ছে

না. ,মন চাইতেছে পাঠকবর্গের খেদমতে আরও কিছু পেশ করি। কিন্তু ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হবে চিন্তা করে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলম রুখতে বাধ্য হচ্ছি। তবুও সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা দান করলাম।

(১)

জিয়ায়্যুল মাক্ছুবাত” নামক কেতাভের বর্ণনানুযায়ী একদা এক হিন্দু জমিদারের সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর উপরস্থ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়। সম্ভাব্য সর্বপ্রকার তদবীরে বিফল মনোরথ হয়ে জমিদার খাজা (রঃ) এর মাজারে এসে উপস্থিত হয়।

তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, সমুদয় সম্পদ পুনরায় হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত অনুজল স্পর্শ করবেনা এবং দরবারও ত্যাগ করবেন না, অত্যন্ত বিভোর অবস্থায় ৩ দিন অতিবাহিত হবার পরে গরীবে নেওয়াজ এক বালক দর্শন দিয়ে “হে জমিদার তুমি কিসের প্রত্যাশী?”

জমিদার স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করলে তিনি বলেন, “তুমি জবানে যা প্রকাশ করবে তা পূর্ণ হবে।”

জমিদার পূর্বোক্ত নিবেদন বাদ দিয়ে এমন একটি জিনিস পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন, যা তাঁকে পরবর্তীকালে উচ্চস্তরে পৌঁছিয়ে দেন।

(২)

এলমে জাহেরীতে বিশেষজ্ঞ বাদশাহ আলমগীর একদা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আজমীর আগমণ করেন। যদি খাজা সাহেবের মাজার হতে তাঁর সালামের জবাব না আসে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে খাজা সাহেবের মাজারসহ পার্শ্ববর্তী সমুদয় মাজার মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন।

বাদশাহ খাজা (রঃ) এর মাজারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে উচ্চঃস্বরে সালাম প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে মাজার হতে “ওয়ালায়কুমুস সালাম ইয়া হুজ্জতে আলমগীর” জবাব আসে। (কারো কারো মতে তিন দিন পরে) এতে বাদশাহ আলমগীর খুবই অনুতপ্ত এবং লজ্জিত হন। খাজা সাহেবের বুজুর্গীর ব্যাপারে তাঁর আর কোনরূপ সন্দেহ রইল না, পরবর্তীকালে তিনি খাজা সাহেবের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

(৩)

একাদ বাদশাহ জাহাঙ্গীর একটি নীল গাভী শিকারে গিয়ে কোনরকম

সুযোগ করতে না পারায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, নীল গাভীটি শিকারে ফলপ্রসূ হলে সেটা জবেহ করে খাজা (রঃ) এর ইসালে সওয়াব করে মিসকিনদের খাওয়াবেন। অনরূপ প্রতিজ্ঞা করবার সাথে সাথে নীল গাভীটি দাঁড়ায়ে গেল। শিকারের পর বাদশাহ স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করেন।

(৪)

বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্যে জানা যায় যে, খাজা সাহেবের মাজারের সন্নিকটে একটি আনার বৃক্ষ ছিল। উক্ত বৃক্ষ হতে কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সাতটি আনার ভক্ষণ করতে সক্ষম হলেই ভক্ষণকারী কামেল ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হতেন।

### মাজার হতেও হস্তক্ষেপ

বাবা ফরিদুদ্দীন গঞ্জ শকর (রঃ) হযরত খাজা (রঃ) এর জেয়ারতে আগমন করেছিলেন। বাবা গঞ্জ শকর যখন যেয়ারতে আসেন, তখন খাজা সাহেবের মাজার ছিল বৃক্ষাচ্ছাদিত একখানা হুজরার মধ্যে।

গঞ্জ শকর (রঃ) স্কন্ধে একখানা কঞ্চল ও জায়নামায, গলায় বা লানো একখানা হেমায়েল শরীফ এবং একখানা ওজীফা সম্বল করে আজ মীরে আগমন করেছিলেন। কোন ব্যক্তি তাঁকে চিনতে সক্ষম হয়নি। চিনবেও বা কি করে যে, এ মহামনীষী অদূর ভবিষ্যতে খাজা বখতেয়ার কাকী (রঃ) এর প্রথম খলিফার গৌরবে গৌরবান্বিত হবেন। স্বীয় পীরের ইহধাম ত্যাগ করবার পরে চিশতীয়া তরিকতের শীরোমণি হবেন।

বাবা গঞ্জ শকর অনেকদিন পর্যন্ত গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর মাজারে নির্জন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন।

উক্ত সময়ের জেলহজু মাসে আরফার দিবাগত রাতে দুই রাকাআত বিশেষ নামায আদায় করে তিনি একাধি চিন্তে খাজা (রঃ) এর মাজারের নিকটবর্তী স্থানে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে “সুরাক্বাহাফ” মতান্তরে “সূরা মরিয়াম” তেলাওয়াত কালীন সময়ে অসাবধানতা বশতঃ একটি শব্দ বাদ দিয়ে পাঠ করতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে খাজা সাহেবের মাজার হতে আওয়াজ আসল, “তুমি অমুক শব্দটা বাদ দিয়ে পাঠ করেছ।”

বাবা গঞ্জ শকর পূর্ণবার উক্ত সূরা পাঠ করলেন। খাজা (রঃ) এর মাজার হতে পুনরায় আওয়াজ আসল “উপযুক্ত ছেলে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক।”

কুরআন শরীফ খতম করে বাবা ফরিদ মাজারের বামপার্শ্বে মস্তক রেখে

অঝোর নয়নে রোদন করতে করতে বললেন “জানি না খোদা কোন স্তরে আমার স্থান নির্ধারণ করেছেন।

পবিত্র মাজার শরীফ হতে পুনরায় আওয়াজ আসল “মৌলানা, যে ব্যক্তি উক্ত নামায আদায় করে, তার স্থান আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীগণের সাথে স্থিরকৃত।”

উপরোক্ত ঘটনার পরে বাবা গঞ্জ শকর পুনরায় এক মুদৎকাল (অর্থাৎ ৪০ দিন) পর্যন্ত ধ্যানস্থ রয়ে কি পরিমাণ বাতেনী ফয়েজ হাসেল করেছিলেন, তা শুধুমাত্র আল্লাহই জ্ঞাত।

পাঠকবর্গ যাতে উক্ত দুই রাকাআত নামায সম্বন্ধে যাতে অবগতি লাভ করে; সে জন্য নিম্নে নামাযের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করলাম।

দুই রাকাআত নফল নামাযের নিয়ত করে নামাযের সমুদয় আরাকীন সমূহ আদায় পূর্বক প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতেহার পরে ১২৫ বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করতে হয়।

### বিশ্ব বরেন্য নেতৃবৃন্দ কর্তৃক খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর মাজারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ

আতায়ের রসুল কুতুবুল আফতাব, শায়খুল মশায়েখ, খাজায়ে খাজে গান, গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন হাসান সঞ্জরী চিশতী (রঃ) এর মাজার আকদাসে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত মশহুর ব্যক্তিবর্গ শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেছেন, তাদের মধ্য কেবল স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে অধ্যায় শেষ করতেছি।

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে পাক ভারত উপমহাদেশে আগত একজন বেনিয়া প্রশাসক খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ)কে উদ্দেশ্য করে যে উক্তি করেছিলেন, উহার বর্ণনার মধ্য দিয়ে এ অধ্যায়ের সূচনা করতেছি। তদানিন্তন ইংরেজ প্রশাসনের অন্যতম প্রভাবশালী ভাইসর লর্ড কার্জন সাহেব বলেছিলেন যে, “আমি পৃথিবীর বুকে অস্বাভাবিক একজন শাসককে লক্ষ্য করেছি, যিনি ইহধাম ত্যাগ করার পরেও প্রচণ্ড প্রতাপের সাথে তাঁর অনুসারী এবং ভক্তবৃন্দকে সুষ্টভাবে পরিচালনা করতেছেন। তিনি হলেন হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী সঞ্জরী (রঃ)।” খাজা সাহেবের প্রতি অনুরক্ত যে সমস্ত রাজা বাদশাহগণের আলোচনা পুস্তকের মূল অংশে আলোচিত হয়েছে, এ অধ্যায়ে তাদের আলোচনা বাদ দেয়া হয়েছে। আফগান বাদশাহ আমীর হাবিবুল্লাহ খাঁ সাহেব ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ সনে খাজা সাহেবের মাজার জেয়ারতে আগমন করে

অনেক দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন।

তাছাড়া পাক ভারত উপমহাদেশের বহু সংখ্যক অলী আল্লাহ ও দরবেশবৃন্দ দলমত নির্বিশেষে খাজা (রঃ) এর জেয়ারতের মাধ্যমে অবর্ণনীয় ফয়েজ হাসেল করেন। আবার অনেকেই উপটোকনের মাধ্যমে স্বীয় ভক্তির পরিচয় প্রদান করেন।

## ভারতীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দের খাজা (রঃ) এর মাজারে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ

ভারতীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দ খাজা আজমীরীর প্রতি ভক্তির যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা অতুলনীয়।

মহাত্মা গান্ধী, মহামান্য রাজা গোপাল আচারিয়া, মহামতি জওহরলাল নেহেরু, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, আততায়ীর হাতে নিহত পাক ভারত উপমহাদেশের তথা বিশ্ববরেণ্য লৌহ মানবী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, তদীয় জ্যেষ্ঠ সন্তান রাজীব গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অতীব ভক্তি সহকারে, খাজা সাহেবের মাজারে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছিলেন।

প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৫ সালের জাতীয় সাধারণ নির্বাচনের সূচনা কালে হযরত খাজা নেজামুদ্দীন আওলীয়া (রঃ) এবং হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতেয়ার কাকী (রঃ) এর মাজারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করে আজমীর শরীফ আগমন করেছিলেন।

তিনি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে খাজা সাহেবের মাজারে পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করে আশীর্বাদ পুষ্ট অবস্থায় নির্বাচনী প্রচারণা আরম্ভ করেন। অনেকের ধারণা খাজা সাহেবের গুণ দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পূর্ববর্তী নির্বাচন সমূহে জাতীয় রেকর্ড ভাঙতে সক্ষম হয়েছিলেন।

## বাংলাদেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দের আজমীর উপস্থিতি

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মরহুম জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেব, প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধান জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, বর্তমান প্রধান মন্ত্রী হাসিনা ওয়াজেদ বেশ কয়েকবার খাজা সাহেবের মাজার জেয়ারত করতে আজমীর আগমন করেছিলেন।

লোক মুখে শ্রবণ করেছি যে, জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেব, খাজা

সাহেবের মাজার সংলগ্ন বেগমী দালানে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪টি অতি মনোরম ঝালর বাতি স্থাপন করেছিলেন।

## খেদমত বা সেবা

হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর মাজারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সর্বাঙ্গে মাজারের অভ্যন্তর ভাগের (গম্বুজের) দেওয়াল হতে আরম্ভ করে সম্পূর্ণ জায়গা বড় “ফররাশা” (ময়ূরের পাল দ্বারা প্রস্তুত) এর সাহায্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মাজারের উপর হতে পুষ্পাদি অপসারণ পূর্বক “চামর” (ময়ূরের সাদা পালক, যা রূপালী কলাই করা হয়েছে) দ্বারা শাহী তখত (মাজারের উপরের পাথর) পরিষ্কার করেন। পরিত্যক্ত পুষ্পরাজী বিবি হাফেজ জামালের মাজারে অর্পণ করা হয়। অতঃপর মাজারের দক্ষিণ এবং পূর্ব পার্শ্বের দরওয়াজাদ্বয় উন্মুক্ত করে দেয়া হয় যাতে ভক্তগণ দিবসের প্রথম জেয়ারত আরম্ভ করতে পারেন।

দুপুর বেলা আড়াই ঘটিকার সময় উপরোক্ত বিধান মতে পুনরায় খেদমত অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে মাজারের উপর চন্দন লেপন করে দেয়া হয় এবং আতর ছিটানো হয়।

## রৌশনী

মাগরিবের নামাযের ১৫ মিনিট পূর্বে ছোট দেগের পার্শ্ববর্তী একটি কুটুরী হতে তিনজন খাদেম মোমবাতি সহকারে মাজার অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন, তখন নাক্কারখানা হতে ডঙ্কার আওয়াজ করা হয়। মাজারের অভ্যন্তরে পশ্চিমের দেওয়ালের সাথে চারজন খাদেম দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকেন। উক্ত সময়ে মাজারের চতুষ্কোণে সংরক্ষিত চারটি রৌপ্য বাতিদানের মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত হয়। এর পরে খাদেম চতুষ্টয় বাতিদানগুলি আপন আপন মস্তকের উপরে ধারণ করে মাজারের অভ্যন্তরে নক্শা করা ফার্সী কাবিতাটি আবৃত্তি করে সালাম পেশ করেন।

এশার নামাযের পরে “শাহী ঘড়িয়াল” যখন পাঁচবার ঘন্টার শব্দ করে তখন রাত্রের খেদমতে অনুষ্ঠিত হয়। খেদমতের অনুষ্ঠান শেষ হলে “শাহী ঘড়িয়াল” পুনরায় ছয়বার ঘন্টা ধ্বনি করার সাথে সাথে সেই রাত্রের মত মাজারে সমস্ত প্রবেশ দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়।

## বার্ষিক ওরশ এবং আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি

হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) এর ওরশের মত শান শওকতময় ওরশ

পৃথিবীর অন্য কোন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় কিনা, তা বলা কঠিন ব্যাপার। আমি পাক ভারত উপমহাদেশের বহু মাজারে গমন করার সুযোগ লাভ করেছি কিন্তু খাজা সাহেবের মাজারের অনুরূপ চাকচিক্যময় মাজার আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

খাজা সাহেবের মাজারে বার্ষিক ওরশ ছাড়াও তাঁর পীর ও মোর্শেদ হজরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ) এর ওরশ এবং অন্যান্য মুসলিম পর্ব সমূহ যথাযথ মর্যাদা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

## ওরশ কর্মসূচী

১৫শে জামাদিউসসানী অত্যন্ত জাক-জমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসর এবং মগ্গরেব নামাযের মাঝামাঝি সময়ে বুলন্দ দরজার পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ওরশ অনুষ্ঠানের প্রথম পদক্ষেপ আরম্ভ হয়।

কিন্তু মাজার কেন্দ্রিক কর্মসূচীর সূচনা হয় ১লা রজব হতে ২৯শে জামাদিউসসানী বেলা আড়াই ঘটিকার সময় “জান্নাতী দরওয়াজা” উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

## ১ম ধৌত করণ

রজব মাসের ১লা তারিখ হতে ৬ষ্ঠ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যহ দুই বার মাজার শরীফ ধৌত করা হয়। সন্দল (চন্দন লেপন) করা হয় এশার নামাজের পর।

## ২য় ধৌত করণ

রাত্রি দুইটা হতে তিন টার মধ্যে ২য় বার ধৌত করা হয়। উক্ত ধৌত করণের সময় সরকারী কর্মচারী ও খাদেমসহ সবমোট ১৪ ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

## সামা অনুষ্ঠান

১লা রজব হতে ৬ই রজব পর্যন্ত মাহফিল খানায় সামা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠান রাত্রি ১১টা হতে ভোর ৪টা পর্যন্ত চলতে থাকে।

## আখেরী দিবস বা কুবুল দিবস

৬ই রজব “সামা” অনুষ্ঠান ১১টায় আরম্ভ হয়ে ১ টায় খতম হয়।

উক্ত দিবসে খাদেমগণ খাজা সাহেবের ভক্তগণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনাখর্ষে বিশেষভাবে দোয়া করে থাকেন। মোনাজাত শেষ হবার পর নাক্কারখানা হতে যখন

ঘন্টাধ্বনী হতে থাকে, তখন ওরশ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করে জান্নাতী দরওয়াজা বন্ধ করে দেয়া হয়। দরগাহর দক্ষিণ পার্শ্বে পাহাড়ে তোপধ্বনির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সমাপ্তির ঘোষণা দেয়া হয়।

## আখেরী ধৌত করণ

উক্ত গোসল অনুষ্ঠান ৯ই রজব অনুষ্ঠিত হয়। আশেকানে খাজাগণ উক্ত দিবস পর্যন্ত আজমীর শরীফে অবস্থান করে তাদের শেষ অর্ঘ্য অর্পণ করে থাকেন।

উক্ত দিবসে মাজারের অভ্যন্তর ভাগ এবং তৎসংলগ্ন এলাকাডিও ধৌত করা হয়।

## আতায়ে রসূল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ)

### এর আমালিয়াত এবং ওজায়েফ

খাজা সাহেব জীবদ্দশায় যে সমস্ত আমালিয়াত এবং ওজায়েফ দ্বারা মানবকুলের দুঃখ, কষ্ট এবং মনোবাহু পূরণে সাহায্য করেছিলেন, সে সমস্ত নির্ভরযোগ্য এবং পরিক্ষিত আমালিয়াত এবং ওজায়েফ সহদয় পাঠকবর্গের খেদমতে পেশ করলাম।

এ অধ্যায় সংযোজনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল, যাতে পাঠকবর্গ দৈনন্দিন সমস্যাবলি হতে সহজে পরিত্রাণ পেতে পারেন এবং উক্ত আমালিয়াত দ্বারা অপরাপর লোকজনকে সাহায্য করতে সক্ষম হন।

উপরন্তু আমার বিশেষ কামনা হল, যদি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি উক্ত আমালিয়াত এবং ওজায়েফ দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপকৃত হলেও, পরিণাম ফল হিসেবে হয়ত আমার মত অসহায়ের পরপারের কিছুটা পাথেয় হতে পারে। আমীন, হুম্মা আমীন।

## সন্তান লাভের দোয়া

গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি সন্তান সন্ততি হতে বঞ্চিত, তার উচ্চৈশ্ব প্রত্যেক নামাজের পরে অত্যন্ত করুণ এবং মিনতি ভরা কণ্ঠে তিন বার নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করা। আল্লাহাতাআলা তাকে কাঙ্ক্ষিত সন্তান দ্বারা পুরস্কৃত করবে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَتِ السَّاعَةَ شَيْئٌ عَظِيمٌ.

ইয়া আইয়োহান্ন নাসো আত্তাকাও রাব্বাকুম ইন্নো যালুযালাভাস্ সাআতা শাইউন আজিম।

## কোন কিছুর প্রভাব বা আসর দূর করার দোয়া

হযরত খাজা (রঃ) বলেছেন যদি কোন ব্যক্তি তিনবার নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করে পানিতে দম করার পর উক্ত পানি আক্রান্ত ব্যক্তির চেহারায় ছিটায় দিলে কিংবা উক্ত দোয়া তিনবার পাঠ করে কানের মধ্যে ফুক দিলে আসরের প্রভাব হতে মুক্ত হবে।

وَإِذَا بَطِشْتُمْ جِبَارِينَ.

ওয়া এয়া বাতাশ্‌তুম জাব্বারিনা।

## বিষাক্ত জীবজন্তুর দংশনের উপশমের দোয়া

আতয়ে রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন, কোন ব্যক্তিকে বিষাক্ত জীবজন্তু দংশন করলে, ক্ষতস্থানে আঙ্গুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক নিঃশ্বাসে সাত বার নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়ে উক্ত ব্যক্তির কানে ফুক দিলে বা পানিতে দম করে উক্ত পানি চেহারার উপর ছিটায় দিলে, ইনশাআল্লাহ্ বিষের ক্রিয়া হতে উপশম পাবে।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَرَبِّائِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٌ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

রব্বানা হাব্বলানা মিন আযওয়াজেনা ওয়া যুরিইয়্যাতেনা কুর্বাতা আ'ইউনিওঁ ওয়া জাআল্‌না লিল্‌মুত্তাকিনা ইমামা।

## রোগ মুক্তির দোয়া

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) বলেন, নিম্নোক্ত দোয়াটি লিখে রুগ্ন ব্যক্তির কণ্ঠে তাবিজ হিসেবে দিলে, খোদার রহমতে ব্যাধি হতে আরোগ্য লাভ করে স্বাস্থ্যবান হবে।

كهيصص - حمعسق ٢٢٣

## রিজিক প্রসারের দোয়া

হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নামায আদায়ের পর অত্যন্ত ভক্তির সাথে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা উক্ত ব্যক্তির রিজিকের প্রসারতা ঘটায় দেন।

وَإِنِ اللَّهُ يَمْسِكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ইন্নাল্লাহা ইউমসেকোস্ সামাওয়াতে ওয়াল্‌আরদা আনতায়ুলা হতে

হালিমান গাফুরা পর্যন্ত পড়বে।

## চক্ষুর জ্যোতি বাড়ানোর দোয়া

খাজা সাহেব বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নামায আদায়ের পর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে আঙ্গুলের ডগায় দম করে চক্ষুর মধ্যে ঘর্ষণ করে, ইনশাআল্লাহতাআলা তার চক্ষুর জ্যোতি কখনও কমবে না বরং যতটুকু কমেছে তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

وَالسَّمَاءُ بَيْنَهُمَا بَايَدٌ وَإِنَّا لَمُوْعَصِعُونَ وَالْأَرْضُ فَرْشُهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.

ওয়াস্‌সামাআ ফাবায়নাহা বায়ীদিওঁ ওয়া ইন্না লামোসেউনা ওয়াল্‌ আরদা ফারার্শ্‌ নাহা ফানে'মাল মাহেদুন।

## অভাব অনটন হতে মুক্তির দোয়া

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) ফরমায়েছেন, যদি কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ আংটির মধ্যে খোদাই করে সব সময় হাতের মধ্যে পরে, তা হলে উক্ত ব্যক্তির সমুদয় অভাব খোদার হুকুমে পূরণ হবে।

وَإِنَّ يَكْفَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.

ওয়া ইন্না ইয়াকাদুল্লাজীনা কাফারু লা-ইউয্লেকুনাকা বে-আব্‌ সারেহিম লাম্মা সামেউয যেক্‌রা ওয়া ইয়াকুলুনা ইন্নাহু লামাজনুনা ওয়া মা হুয়া ইল্লা যেক্‌রুন লিলআলামিনা।

## আমালিয়াতে সফল কাম হবার দোয়া

খাজা সাহেব বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি আমল করার সময় নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করে, তা হলে সহজে আমলে সফল কাম হবে।

إِذِ السَّمَاءُ شَقَّتْ . وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ . وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ . وَالْقَتَّ مَافِيهَا وَتَخَلَّتْ .

ইয়াস্‌ সামাউন শাক্বাত ওয়া আযিনাত লিরাবিহা ওয়া হোক্বাত ওয়া এযাল্‌

## দৈব-দুর্বিপাকের হাত হতে রক্ষা পাবার দোয়া

খাজা সাহেব বলেছেন যে, নিম্নোক্ত আয়াত পড়ে জলখান কিংবা জন্তুর উপর আরোহন করলে, যাত্রাকালীন সময়ের সমুদয় বিপদাপদ হতে রক্ষা পাবে।

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ أَخَذَكُمْ بِنُصِيحَتِهَا أَنْ رَبِّي عَلَى صِرَاتٍ.

ইনি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহে রাবি ওয়া রাবেবকুম মামিন দাব্বাতিন ইল্লা হয়্যা আখেযুকুম বেনাসি-ইয়াতেহা ইল্লা রাবি আলা শ্বেরাত্তে।

ঠাণ্ডা লাগার দরুণ কোন ব্যক্তি জ্বরে আক্রান্ত হলে, কুল গাছের লাকড়িতে উক্ত আয়াত লিখে গলায় বুলায়ে দিলে ইনশাআল্লাহ জ্বর সেরে যাবে।

## বিদ্যার্জনের জন্য দোয়া

আতায়ে রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেছেন যে, প্রত্যহ ফজরের নামাযের পরে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করলে বিদ্যা অর্জন করা সহজ হবে।

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى.

মিন্হা খালকনাকুম ওয়া ফিহা নুয়ীদোকুম ওয়ামিন্হা নোখরেজোকুম তারাতান উখরা।

## ব্যথা-বেদনা উপশমের দোয়া

খাজা (রঃ) বলেছেন, ব্যথার স্থানে হস্ত স্থাপনপূর্বক নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করে তিনবার ফুক দিলে ইনশাআল্লাহ সহজভাবে আরোগ্য হয়ে যাবে।

كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ زِرَاعَتِهِ بِالْوَصِيدِ.

কাল্বোহুম বাসেতুম যেরাআতেহী বিল্ ওয়াছিদে।

## সংকট হতে উদ্ধারের দোয়া

খাজা সাহেব বলেছেন যে, বিপদকালীন সময়ে নিম্নে উদ্ধৃত আয়াত পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ বিপদ হতে রক্ষা পাবে।

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানাকা ইনি কুনতো মিনাজ যোয়ালিমিন।

## সাহায্যকারী দোয়া

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) ফরমায়েছেন, যত প্রকারের বিপদাপদ আছে, তা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফজরের সুনত এবং ফরয নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে বিসমিল্লাহের আখেরী মিমের সাথে আলহামুদু শরীফ মিলায়ে ৪১ বার পাঠ করে (প্রত্যেকবার শেষ হলে ৩বার “আমীন” বলতে হবে) খোদার নিকট মিনতি ভরা কণ্ঠে দোয়া করলে যে কোন ধরণের বিপদাপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমিল হাম্দু লিল্লাহে রাবিবিল আলমিন।

## খাজেগানে চিশ্ত এর দোয়া

আতায়ে রসুল খাজা আজমিরী (রঃ) বলেছেন নিম্নলিখিত দোয়াটি ফজরের ফরয নামাযের পরে নিয়মিতভাবে পাঠ করলে সমুদয় পেরেশানী হতে মুক্ত থাকা যায় এবং আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত উদ্দেশ্য সফলকাম হয়।

اللَّهُمَّ زِدْنَا نُورَ فَوْجِدِ شُرُورِ نَعُوذُ مَعْرِفَتِنَا وَأَعُوذُ طَاعَتِنَا  
وَأَعُوذُ نِعْمَتِنَا وَأَعُوذُ مَحَبَّةِ وَأَعُوذُ صَوْتِنَا وَأَعُوذُ زَلِينَا  
وَأَعُوذُ قَتْوَقِنَا وَأَعُوذُ قَبُولِنَا وَأَعُوذُ إِنْسَانِنَا وَأَعُوذُ عَلْمِنَا  
وَأَعُوذُ حِلْمِنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

আল্লাহুম্মা যেদনুরে ফাওয়াদাযাদু সুরুরে নাওয়ায়ু শা'রেফাতেনা ওয়ায়ু মে'মাতেনা ওয়ায়ু মুহাব্বাতান ওয়ায়ু সুতেনা ওয়ায়ু জুলেনা ওয়ায়ু ফাওকেনা ওয়ায়ু কোবুলেনা ওয়ায়ু এনসানা ওয়ায়ু এল্মেনা ওয়ায়ু হেলহমেনা বেরা মাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমিন।

তিনি আরও বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি আসর নামাযের পর হতে মাগরেব পর্যন্ত আল্লাহতায়ালার নিম্নোক্ত নামগুলি পাঠ করলে তার কোনরূপ সমস্যা থাকবে না।

اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ

আল্লাহ্ ইয়া রাহমানো, ইয়া রহিমো।

### অভাব অনটন হতে পরিত্রাণের দোয়া

খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) ফরমায়েছেন, কোন ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার নামাজের পর ৭০ বার নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করলে সৃষ্টি জগতের কারো দয়ার উপর কখনও নির্ভরশীল হতে হবে না।

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ وَعَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ أَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

আল্লাহ্‌মা আগ্‌ফেনী বেহালালেকা ওয়া আন্ হারামেকা ওয়া বেতাআতেকা আন্ মো'সে-ইয়াতেকা ওয়া-বেফাজলেকা আম্মান সেওয়াকা বেরাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমিন।

### ইস্মে আজম

আতায়ে রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেছেন যে, ইস্মে আজম হল প্রত্যেক নামাযের পরে নিম্নলিখিত দোয়াটি ১০০ বার পাঠ করে স্বীয় মনস্কামনা পূরণার্থে আল্লাহর নিকট করুণভাবে প্রার্থনা করা।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

ইয়া হাইয়ো ইয়া কাইয়োমো

### হারানো বস্তু প্রাপ্তির দোয়া

খাজা সাহেব বলেছেন, কোন বস্তু হারিয়ে গেলে নিম্নলিখিত দোয়াটি বিশেষ উপকারী।  
يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ عَظِيمٌ عَلَى جَمْعَةٍ.  
ইয়া জামেয়ান্না সে লে-ইয়াওমিন লা রায়বা ফিহে আজমাআ আলা জামাতী।

### শত্রুকে পদানত করার দোয়া

খাজা (রঃ) বলেছেন, কোন শত্রুর সম্মুখীন হলে, নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করলে দুশমন কাবু হয়ে যায়।

يَا سُبُّوحَ يَا قُدُّوسَ يَا غَفُورَ يَا وَدُودَ

ইয়া সুব্বুহ্ন ইয়া কুদুসুন ইয়াগাফুরন ইয়া ওয়াদুদুন।

### শির-দাঁড়ার ব্যথা উপশমের দোয়া

খাজায়ে খাজেগান হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) বলেছেন যে, ব্যথাস্থলে হস্ত স্থাপন পূর্বক নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করলে সহসা ব্যথা উপশম হয়।

اللَّهُمَّ ذَهَبَ عَنْهُ سِوَا مَا يَجِدُوا وَمَخَشَهُ وَيَوْمِ  
نُبِيِّكَ مَلَكَيْنِ الْمُبْرَكِ عِنْدَهُ

আল্লাহ্‌মা যিহাব আনহু সুআ মা ইয়াজেদো ওয়া মাখশাহ ওয়া'ওয়াওমে নাবিয়োকাল মালকিনেল মোবারাকে এন্দেরকা।

দস্ত ব্যথায় কষ্ট পেলে শাহাদৎ আঙ্গুলি উক্ত দস্তুর উপর চেপে ধরে দোয়াটি পাঠ করতে হবে।

بِسْمِ اللَّهِ وَيَا لِلَّهِ أَسْمَاءُكَ بَعِزَّتِكَ وَجَلَالُكَ وَقُدْرَتُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرْتِمَ لَمْ تَلِدْ غَيْرَ عَيْسَى وَبِكَلْمَتِكَ عَنْ تَنْشِفَ مَاءَكَ فَلَانٌ بِنِ فَالَانَ أَوْ تِلْكَ فَالَانَةُ بِنَةُ فَالَانَةِ مِنَ الدَّرِّ.

বিস্মিল্লাহে ওয়াবিলাহে আস্মায়া লোকা বেইজ্জাতেকা ওয়া জালালেকা

খাজা গরীবে নেওয়াজ ১৫৩

ওয়া কুদরাতেকা আলা কুল্লে শাইয়িন ফাইন্না মারইয়ামা লাম তালিদ গায়রা ঈসা মিররুহেকা ওয়া বেকালেমাতেকা আন তানশেফা মা ইউলকা ফোলানো বিন ফোলানিন আও তাল্কা ফালানাতো বোনাতো ফালানাতা মিন্নাজ্জু দুর্রে।

### আমালিয়াত

#### হুজুর আকরাম (দঃ)কে স্বপ্ন যোগে দর্শন করার তদবীর

আতায়ে রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) তাঁর প্রথম খলিফা হজরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতেয়ার কাকী (রঃ)কে হুজুর (দঃ) এর দর্শনের (স্বপ্নযোগে) নিমিত্তে নিম্নলিখিত দরুদ শরীফটি এক হাজার বার পাঠ করার নির্দেশ দান করেছিলেন।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَحَبِيبِكَ رَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأَمِّ وَعَلَى آلِهِ.

আল্লাহুমা সাল্লে আলা মোহাম্মদিন আবদোকায়্যা ওয়া হাবিবেকা রাসুলেকাল্ নাবিউল উম্মি ওয়া আলা আলেহি।

#### চক্ষুর জ্যোতি অক্ষুন্ন রাখবার তদবীর

খাজা সাহেব বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি চক্ষুর জ্যোতি অক্ষুন্ন রাখতে আকাঙ্ক্ষিত হলে, প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর দুই বার নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করে আঙ্গুলের ডগায় দম করে পুনরায় আর একবার পড়ে চক্ষুর উপর মালিশ করলে চক্ষের জ্যোতি অক্ষুন্ন থাকে।

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. وَأَنْتَ الْوَجْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ.

লা-ইলাহা হুইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউম, ওয়া আনাতেল ওয়ুহু লিল-হাইয়েল কাউম।

খাজা গরীবে নেওয়াজ ১৫৪

#### সব রকমের প্রয়োজন মিটানোর তদবীর

খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) ফরমায়েছেন যে, প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে তার সর্বপ্রকার প্রয়োজন পূরা হবে।

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ تَدَايَةَ وَبِكِرَامِكَ تَدَايَةَ وَبِنُورِ قَدْسِيقِ تَدَايَةَ وَبِفَضْلِكَ التَّفَايِسُ وَالشَّتْفُفِرْكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ أَيْضًا.

আল্লাহুমা বে-এস্মেকাব তাদায়তো ওয়া বেকারামেকা তাদায়তো ওয়াবে-নুরে কাদসেকাহ তাদায়তো ওয়া বে-ফাজলেকাস তাগায়সো ওয়াস্ তাগফেরোকায়্যা আতুবো এলায়াকা আয়জান।

#### ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করবার তদবীর

হযরত খাজা (রঃ) ব্যবসায়ী সমাজকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, যদি ব্যবসায় কেউ উন্নতি লাভ করার জন্য আগ্রহান্বিত হয়, তবে সে যেন নিম্নোক্ত দোয়াটি বেশী বেশী করে পাঠ করে।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.

আল্লাহুমা সাল্লে আলা মোহাম্মদিন আবদেকা ওয়া রাসুলেকা ওয়া সাল্লে আলা জামিয়েল মো'মেনিনা ওয়াল মোমেনাতে ওয়া মোস্লেমিনা ওয়াল মোস্লেমাতে।

#### চক্ষুর যন্ত্রণা লাঘবের তদবীর

খাজা সাহেব বলেছেন যে, চক্ষুর ব্যথা হলে কিংবা চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি করতে চাইলে নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করে আঙ্গুলের ডগায় দম করে চক্ষুর উপরে মালিশ করতে হবে।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.

খাজা গরীবে নেওয়াজ ১৫৫

আল্লাহ লা-ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইউল কাইউম।

তৎপর নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করে অনুরূপ করতে হবে।

اَلَمْ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ.

আলিফ লাম মিম আল্লাহ লাইলাহা ইল্লাহুয়াল হায়উল কাইয়ুম।

তৎপর নিম্ন দোয়াটি পাঠ করে অনুরূপ করতে হবে।

اَنْتَ الْوَسُوْحُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ.

আনতাল ওয়ুহু লিল হাইউল কাইউম।

### সমস্যার সম্মুখীন হলে তদবীর

আতায়ের রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি সমস্যার সম্মুখীন হলে চারি রাকাআত “সালাতুল আশেকীন” নিম্নলিখিত নিয়মে আদায় করবে। প্রত্যেক রাকাআতে নামাযের নিয়ম পালন করবে।

১ম রাকাআতে ইয়া আল্লাহ- ১০০ বার

২য় রাকাআতে ইয়া রাহমানু- ১০০ বার

৩য় রাকাআতে ইয়া রহীমু- ১০০ বার

৪র্থ রাকাআতে ইয়া দাউদু- ১০০ বার

### ঋণ পরিশোধের তদবীর

আতায়ের রসুল খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) বলেছেন যে, ঋণ গ্রস্ত ব্যক্তি ভক্তি সহকারে প্রতি জুমার নামাযের পর নিম্নলিখিত দোয়াটি একশত বার করে পাঠ করতে থাকে উক্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ কখনও কোন লোকের মুখাপেক্ষী করবে না এবং তার সমুদয় কর্জ পরিশোধ হয়ে যাবে। কারো কারো মতে ১ জুমা হতে অন্য জুমার মধ্যে সম্পদশালী হয়ে যায়।

اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيَّ يَا حَمِيْدُ يَا مُعِيْدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ اَللّٰهُمَّ  
اَلْقِضْنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَنَاتِكَ عَنْ مَّشِيْتِكَ وَاغْنِنِيْ

খাজা গরীবে নেওয়াজ ১৫৬

عَمَّنْ سِوَاكَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِيْمُ الرَّحِيْمِيْنَ.

আল্লাহু ইয়া গানিও ইয়া হামিদু ইয়া মুয়িদু ইয়া রাহিমু ইয়া ওয়াদুদু আল্লাহুয়াক যেনি বেহালালেকা আন হারামেকা ওয়া বেতানাতেকা আন মাহিয়াতেকা ওয়া আগনী আশ্মান সেওয়াকা বেরাহমাতেকা ইয়া আর হামার রাহেমিন।

### এস্তেখারা

প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞাত হবার জন্য উদগ্রীব থাকে। স্বীয় অদৃষ্টের বা কর্মের ফলাফল জ্ঞাত হতে লালায়িত ব্যক্তিবর্গের জন্য অনেক রকম তদবীর আছে। তৎমধ্যে নিম্নলিখিত তদবীরটির প্রতি খাজা সাহেব বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন

### নিয়ম

রাত্রে শয়ন করবার পূর্বে ওয়ু করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করে পশ্চিম দিকে মুখ রেখে শয়ন করতে হবে এবং তৎপর নিম্নোক্ত দোয়া সমূহ পাঠ করতে হবে।

যথা- ৭ বার সূরা “ওয়াসামস ওয়াদ্দোহা” তৎপর সূরা “ওয়াল্লায়লু” ৭ বার, তৎপর সূরা এখলাস ৭ বার পাঠ করে, আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করবে “হে খোদা, আমার কর্মের ফলাফল আমাকে জ্ঞাত কর এবং আমাকে সংকট হতে উদ্ধার কর।

### খতমে খাজেগান

আতায়ের রসুল খাজায় খাজেগান হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (রঃ) ফরমায়েছেন যে, কঠিন পীড়া, বিপদাপদ হতে রক্ষা, সর্বপ্রকার মনঃবাসনা পূরণ, পদীক্ষায় কৃতকার্যতা এবং চাকুরী লাভের জন্য নিম্নোক্ত খতমটি অধিতীয়-

সূরা ফতেহা শরীফ-

১০০ বার

দরগদ শরীফ-

১০০ বার

## খাজা গরীবে নেওয়াজ ১৫৭

সুরা আলাম নাশ্‌রাহুলাকা- ৭০ বার

সুরা এখলাস্‌- ১০০০ বার

পুনরায় সুরা ফাতেহা- ৭ বার

পুনরায় দরুদ শরীফ- ১০০ বার

নিম্নলিখিত দোয়া সমূহ ১০০ বার করে পাঠ করে স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য খোদার নিকট দোয়া করতে হবে।

فَسَهِّلْ يَا إِلَهِي كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَتِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ  
سَهِّلْ بِفَضْلِكَ يَا عَزِيزُ.

ফাছাহিল ইয়া ইলাহী কুল্লা সাঅবিন বেহুরমতি সৈয়্যাদিল আবরার সাহহিল বেফাদলিকা ইয়া আজীজু।”

এয়া ক্বাজিয়াল্ হাজা ৫- ১০০ বার

এয়া ক্বাফিয়াল মুহিম্মাত- ১০০ বার

এয়া দাফিয়াল বালিয়াত- ১০০ বার

এয়া মুজিবাদ দাওয়াত- ১০০ বার

এয়া রাফেআদ দারাজাত- ১০০ বার

এয়া হাল্লালাল মুশকিলাত- ১০০ বার

এয়া গাউসু আগিশনি ওয়া আম্দিদনী- ১০০ বার।